শরৎ-বন্দনা

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে
নিবেদিত রচনাবলী

শ্রীনরেন্দ্র দেব
সম্পাদিত

সাহিত্য বিভাগ
শরৎ-বন্দনা সমিতি

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
কলিকাতা

শরৎ-বন্দনার রচয়িতা ও রচয়িত্রী-গণ—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১	কুঞ্জধন দে	৯৬
প্রমথ চৌধুরী	৪	আশালতা দেবী	৯৮
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	৭	সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত	১০৯
সোমনাথ মৈত্র	১৩	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১১১
জলধর সেন	১৭	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১১৬
প্রিয়ম্বদা দেবী	২২	বিশ্বপতি চৌধুরী	১১৮
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩	প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	১২৭
মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৩২	জগৎ মিত্র	১২৯
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	৩৩	অপরাজিতা দেবী	১৩৪
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	৪০	মণীন্দ্রনাথ রায়	১৩৬
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৪১	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৯
কালিদাস রায়	৪৮	নিরুপমা দেবী	১৫০
রাধারাণী দেবী	৪৯	সুশীলচন্দ্র মিত্র	১৫২
গিরিজাকুমার বসু	৫৬	রামেন্দু দত্ত	১৫৬
অবনীনাথ রায়	৫৯	অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল	১৫৮
নরেন্দ্র দেব	৬৬	মনোজ বসু	১৬২
প্রবোধকুমার সান্যাল	৬৭	পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়	১৬৪
হুমায়ুন কবির	৭৩	নীহাররঞ্জন রায়	১৭৭
শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী	৭৬	লতিকা বসু	১৮৫
সুকুমার সরকার	৮৫	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৯৬
মৃণাল সর্ব্বাধিকারী	৮৭	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৯৮

আশু চট্টোপাধ্যায	২০৭
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	২০৮
সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায	২১৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র	২১৬
মোহিতলাল মজুমদার	২২০
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায	২২৩
কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায	২২৮
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায	২৩১
আশীষ গুপ্ত	২৩০
করুণা নিদান বন্দ্যোপাধ্যায	২৩৫
সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায	২৩৭
হীরেন্দ্রকুমার বসু	২৪৩
স্বদেশবাসিনিগণের অভিনন্দন	২৪৪
স্বদেশবাসিগণের অভিনন্দন	২৫০

Sri Kumud Nath Dutta
14C, KALI KUMAR BANERJEE LANE
TALA, CALCUTTA-2.

সম্পাদকের নিবেদন

শরৎ-বন্দনা উৎসব উপলক্ষে একটি সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান ক'রবার প্রস্তাব হ'য়েছিল যেদিন, পূর্ণ একমাস সময়ও সেদিন আমাদের হাতে ছিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে ওঠা সম্ভবপর হবে না ব'লে আমরা অনেকেই এ প্রস্তাব অনুমোদন ক'রতে পারিনি। কিন্তু শ্রীমান মৃণাল সর্ব্বাধিকারী ও তাঁর বন্ধু শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, দুলালচন্দ্র সোম ও সুখময় চৌধুরী প্রমুখ জনকয়েক উৎসাহী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবক এই অসম্ভবকে নিশ্চয়ই সম্ভব ক'রে তুলবেন ব'লে কেবলমাত্র ভরসা দেওয়া নয়—এক দিনেই তাঁরা প্রায় পঁচিশজন সুসাহিত্যিকের প্রতিশ্রুতি এনে দেন যে ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে শরৎ-বন্দনা উপলক্ষে তাঁদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু রচনা পাওয়া যাবেই।

এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর ক'রেই শরৎ-বন্দনা সমিতির সাহিত্য-বিভাগ সম্মিলনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন এবং স্থির করেন যে ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে রচনাগুলি পাওয়া গেলে একত্রে মুদ্রিত ক'রে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে "শরৎ-বন্দনা" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ ক'রবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে সকলের রচনা আমাদের হস্তগত হ'তে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখও উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলো। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে একখানি ১৬ ফর্ম্মার বই ছেপে বার করা যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, একথা সকলেই জানেন; কিন্তু দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রে সেই অসাধ্যই

সাধন ক'রেছেন শ্রীগুরু লাইব্রেরীর অদম্য অধ্যবসায়ী সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার মহাশয়। শরৎ-বন্দনা সমিতির পক্ষ হ'তে তাঁকে আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীমান মৃণাল সর্ব্বাধিকারী এবং শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে শরৎ-বন্দনা গ্রন্থের জন্য প্রভূত পরিশ্রম ক'রেছেন,—সেজন্য তাঁদের কাছেও শরৎ-বন্দনা সমিতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা একাজে অগ্রণী এবং এতটা উৎসাহী না হোলে "শরৎ-বন্দনা" গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া আজ সম্ভব হ'ত না। তাঁরা প্রত্যেক লেখক লেখিকাদের কাছে বহুবার যাতায়ত ক'রে, বহু আয়াসে তাঁদের রচনা সংগ্রহ ক'রেছেন, মুদ্রন কার্য্যের তত্ত্বাবধান ক'রেছেন এবং প্রুফ সংশোধনরূপ কষ্টকর কার্য্যেরও ভার নিয়েছেন। প্রুফ সংশোধনের কার্য্যে তাঁদের প্রধান সহায়ক ছিলেন শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়। তাঁর কাছেও সমিতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

পাঁচদিনের মধ্যে ছাপা এত বড় একখানি বই যে কোনমতেই নির্ভুল হ'তে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। কাজেই যে অসংখ্য ভুল চুক্ ও ক্রটী বিচ্যুতি এর মধ্যে র'য়ে গেলো আশা করি সেজন্য কেউ আমাদের দণ্ডনীয় ব'লে মনে ক'র্‌বেন না।

যার যে রচনা পরের পর যেমন পাওয়া গেছে অনেকটা প্রায় সেই ভাবেই শরৎ-বন্দনা গ্রন্থে তা' স্থান পেয়েছে। সময়াভাবে বিশেষ কোন একটি ক্রম অনুসরণ ক'র্‌বার সুযোগ ও সুবিধা হয় নি এবং ভাল মন্দ বিচার ক'র্‌বার অবকাশও পাওয়া যায় নি। কয়েক জনের সুচিন্তিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ দুর্ভাগ্যক্রমে বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় স্থানাভাবে তাঁদের সুদীর্ঘ প্রবন্ধগুলির অংশবিশেষ মাত্র ছাপা

হ'য়েছে—এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমরা তাঁদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ছি।

যাঁরা এই অল্প সময়ের মধ্যেই শরৎ-বন্দনা উপলক্ষে তাঁদের মূল্যবান্ রচনা পাঠিয়ে আমাদের এই আয়োজনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাঁদের সকলকেই শরৎ-বন্দনা সমিতির পক্ষ হ'তে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দু'একটি পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনাও লেখকদের ইচ্ছায় ও অনুরোধে 'শরৎ-বন্দনা'য় স্থান পেয়েছে।

৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯

বিনীত
শ্রীনরেন্দ্র দেব।
সম্পাদক—সাহিত্য বিভাগ
শরৎ বন্দনা সমিতি

সভ্যগণ—

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীআশীষ গুপ্ত
শ্রীরাধারাণী দেবী
শ্রীসোমনাথ মৈত্র
শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র।
শ্রীগিরিজাকুমার বসু
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
শ্রীঅবনীনাথ রায়
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল
শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী

ওঁ

উত্তরায়ণ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু—

শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষ্যে পত্র যোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্ম্মসাধনার অন্তিম পর্ব্বে আমি পৌঁচেছি।

কর্ত্তব্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনো যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্ত্তনমাত্র। এই কারণেই অল্প দিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ ক'রে চুকিয়ে দিয়েছে! সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয় তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তার পরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তিমাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়, এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুইপাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক্। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরম প্রান্তবর্ত্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার

অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথ-যাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চল্‌ছেনা রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হ'য়ে রথ সম্মুখের দিকে চল্‌বে।

কালের রথ যাত্রার বাধা দূর কর্‌বার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্ব্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎ-বন্দনা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আজকের দিনে বাঙলার পাঠক সমাজ শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সর্ব্বজনসমক্ষে নিবেদন করবার জন্য একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, এবং এই উপলক্ষ্যে আমিও দু-কথা বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি।

কেন জানিনে, অনেকে আমাকে একটি চতুর সমালোচক ব'লে গণ্য করেন। সুতরাং তাঁরা হয়ত আমার মুখে শরৎ-সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা শুনতে চান।

আমি রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে প্রবন্ধ লিখি, তা এই ব'লে আরম্ভ করি যে—"আজকের সভা রবীন্দ্র সাহিত্যের বিচারালয় নয়। আজ এ ক্ষেত্রে আমরা সমবেত হয়েছি বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের প্রতি আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে।"

অর্থাৎ যখন কোনও সাহিত্যিক লোক-সমাজের নিকট একটি বিশিষ্ট লেখক ব'লে গণ্য হন, তখন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে লোক-সমাজকে পরিচিত ক'রে দেবার কোনও সার্থকতা নেই। আর সমালোচনার অন্য যে উদ্দেশ্যই থাক্ না কেন, কোনও বিশেষ সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠক সমাজের কৌতূহল উদ্রেক করাও তার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যা সকলেই দেখতে পান তা তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টাটি কি হাস্যকর নয়?

আমরা নিত্য বলি, সাহিত্যের বিশেষ ধর্ম্ম হ'চ্ছে—পাঠককে আনন্দ দান করা। আর লোকপ্রিয় সাহিত্য যে বহু লোককে আনন্দ দান করেছে—সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। শরৎ-সাহিত্যের বহু নিন্দাও শুনেছি; বহু প্রশংসাও শুনেছি। কিন্তু সমালোচকদের সেই নিন্দাপ্রশংসা অতিক্রম ক'রে, এ সাহিত্য লোকপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সে সাহিত্য বহু লোকের মনকে স্পর্শ ক'রেছে এবং উৎফুল্ল ক'রেছে। যে সাহিত্য নিজগুণে লোক-সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তার সম্বন্ধে সমালোচক আর বেশি কি ব'লতে পারেন?

এ ক্ষেত্রে আমি একটিমাত্র কথা ব'লতে চাই। দেশে যাঁরা বড় সাহিত্যিক ব'লে গণ্য হ'য়েছেন, পাঠক সমাজ যে তাঁদের শ্রদ্ধার পাত্র ব'লে মনে করেন, এ লেখক মাত্রের পক্ষেই অতি সুখের কথা।

আমাদের দেশে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের যথোচিত প্রীতিও নেই, ভক্তিও নেই। দেশের যাঁরা কাজের লোক, অর্থাৎ হাকিম, কেরাণী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাঁরা আজ পর্য্যন্ত বাঙালী লেখকদের উপেক্ষা ক'রে আস্‌ছেন; যদিচ এ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের বিলেতি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হ'য়েছে।

স্বজাতির মনের আনুকূল্য না থাক্‌লে কোনও দেশে জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যাঁর প্রতিভা আছে, তিনি অবশ্য স্বজাতির এ ঔদাসীন্য উপেক্ষা ক'রে, সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা ক'রলে দেখা যায় যে, প্রতিভাশালী,

ব্যক্তি সকল দেশে, সকল কালেই অতি বিরল। অপরপক্ষে সাধারণ লোকের পক্ষে সমাজের এরূপ আনুকূল্য নিতান্ত প্রয়োজন। এমন কি Goethe-এর আদিগ্রন্থ Sorrows of Werther যদি তার প্রকাশমাত্রেই সর্ব্বজন-আদৃত না হ'ত, তাহ'লে হয়ত তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হ'ত না।

শরৎচন্দ্রকে পাঠকসমাজ আজকের দিনে যে সম্মান দেখাচ্ছেন, তার ফলে শুধু শরৎচন্দ্র নয়—দেশের সাহিত্যিকমাত্রেই ধন্য হবে। সাহিত্য মানব-সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করে, সমগ্র সমাজ স্বীয় সভ্যতারই প্রমাণ দেন। এই কারণে আমি এই শরৎবন্দনাকে একটি শুভ সামাজিক ব্যাপার বলে মনে করি। এবং এ ব্যাপারের ফলে বাঙলা সাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধি হবে—সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এ বন্দনায় যোগদান ক'রছি—একটি স্বনামধন্য বাঙালী সাহিত্যিকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রতে এবং সেই সঙ্গে ভাবী বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির আশায়।

শরৎ-সংবর্দ্ধনা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

আটান্ন বছরে পা দিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই শরৎচন্দ্র আপনাকে বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন—আর তাঁর যে বয়স হইয়াছে তাতে বাঙ্গালীর পক্ষে আপনাকে বুড়া বলিবার অধিকার তো আছেই।

কিন্তু বুড়া তিনি হন নাই, কোনও দিনই হইবেন না। যতদিন বাঙ্গলা সাহিত্য থাকিবে, তিনি থাকিবেন চিরনবীন—চিরযুবক। কেন না, যে রসে তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যাতে তার উৎকর্ষ সেটা বুড়ার রস নয় যৌবনের রস।

শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন যে চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁর চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাতে কারও মুখ তিনি কোনও দিনই দেখিতে পান নাই। তাঁর কাছে চাঁদ শুধু চাঁদই—ফুল ফুলই। অর্থাৎ তাঁর মতে তিনি দারুণ অকবি।

তাঁর এ কথার ভিতর যে ইঙ্গিত আছে তাহা কবিদের পক্ষে শ্লাঘার কথা নয়। কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে লোককে যে কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। একথা সত্য যে তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া অসত্য কল্পনাকে সত্য বলিয়া দাখিল করিয়া সাহিত্যের দরবারে মনসবের দাবী করেন নাই কোনও দিন। যাহা তিনি অনুভব না করিয়াছেন, যাহাকে সত্য বলিয়া না জানিয়াছেন তাহাকে রস বলিয়া গোঁজামিল দিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন নাই।

অবেক্ষণ ও অনুভূতির বিষয়ে এই নিদারুণ সত্যনিষ্ঠাই তাঁর রচিত সাহিত্যের সৌষ্ঠবের একটা প্রধান উপাদান।

কিন্তু একথা সত্য নহে যে জগৎকে তিনি অ-কবির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কিম্বা তার ভিতর সাধারণ লোকে যাহা দেখিয়াছে তার চেয়ে বেশী কিছু দেখেন নাই। সব কবির মতই তিনি জগৎ ও জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন অনেক কিছু যা সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না। জগৎ ও জীবনের রসমূর্ত্তি তাঁর চোখে অপরূপ ভাবে প্রকাশ হইয়াছে, আর তাহাই তিনি সুনিপুণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

চাঁদের দিকে চাহিয়া যে শ্রীকান্ত কারও মুখ দেখিতে পায় নাই, বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোনের তাণ্ডবলীলায় সে পাইয়াছে অপরূপ আনন্দ। সাইক্লোনের যে বিভীষিকাময় অপরূপ রূপ তাহা তার চক্ষেই প্রকাশ হইয়াছে, আর ফুটিয়া উঠিয়াছে এক অপরূপ শব্দ-চিত্রে। অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রেও শ্মশান, নিশীথের বিদীর্ণ নদীবক্ষ, শ্রীকান্তের চোখে একটা অপরূপ বিভীষিকাময় কিন্তু চিত্তহারী রসরূপে ভাসিয়া উঠিয়াছে। চাঁদের ভিতর শরৎচন্দ্র কারও মুখ দেখিতে না পারেন, ফুলের মাঝে তিনি কোনও অজানা রূপসীর সন্ধান না পাইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতির যে ভয়ঙ্কর রূপ, তার ভিতর তিনি শোভা দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, সাইক্লোন ও শ্মশান তাঁর চিত্ত হরণ করিয়াছে, তার জড়রূপে নয়, তার ভিতর যে চেতনার স্পর্শ তিনি পাইয়াছেন তাহাতে।

প্রকৃতির ভিতর যেমন তাঁর পক্ষপাত তার স্নিগ্ধ পেলব বস্তুগুলির

প্রতি নয়, তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির প্রতি, তেমনি মানবজীবনের প্রতি দৃষ্টিতে তাঁর স্পষ্ট পক্ষপাত সৃষ্টিছাড়া উৎকেন্দ্র মানবচরিত্রের প্রতি। সমাজের সম্মান যে মানদণ্ডে পরিবেশ করা হয় সে মানদণ্ড তাঁহার নয়! সমাজে যারা অনাদৃত, উপেক্ষিত, কিন্তু মনুষ্যত্বের খাঁটি আদর্শে যারা কারো চেয়ে ছোট নয় তাদের লইয়াই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সংসার? ভবঘুরে শ্রীকান্ত, ডানপিটে ছোকরা ইন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন সতীশ, পতিতা রাজলক্ষ্মী, স্বামীত্যাগিনী অভয়া, কলঙ্কালঙ্কৃতা অন্নদা দিদি, দুশ্চরিত্র জীবানন্দ ইহারাই সে সংসারের প্রধান ব্যক্তি। তোমার আমার মত সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ, যারা মামুলির মাপকাটি দিয়া কর্ম্ম নিয়মিত করিয়া, যাকে পাপ বলি তাহা হইতে কোনও মতে টায়-টোয় আত্মরক্ষা করিয়া, পুণ্যের ঠাট কোনও মতে বজায় রাখিয়া দিন কাটাইয়া দেয়—এদের লইয়া তাঁর কল্পনার কারবার নাই। এই সব "শিষ্ট শান্ত ভদ্র" নরনারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের অশ্রদ্ধা ও অনুকম্পা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে সুপরিস্ফুট।

অনেকের মুখে শুনিয়াছি, শরৎচন্দ্র রিয়ালিষ্ট বা বাস্তবপন্থী। রোমাণ্টিক লেখকগণ জীবনের যথাযথ চিত্র আঁকেন না, তাঁদের পাত্র-পাত্রীগণ ঠিক সংসারের যেমনটি দেখা যায় তেমন নয়, তাঁদের লেখকদের মতে যেমন হওয়া উচিত তেমনি। রিয়ালিষ্টেরা এই সব লেখার অবাস্তবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া আঁকেন জীবনের বাস্তবচিত্র, যার ভিতর আদর্শের দ্বারা জীবন নিয়মিত হয় না, হয় জৈব আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া—প্রতিক্রিয়ায়। যাঁরা শরৎচন্দ্রকে রিয়ালিষ্ট বলিতে চান তাঁরা মনে করেন যে শরৎচন্দ্রও তেমনি জীবনের

ভদ্র আচরণ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন তাঁর নগ্ন বীভৎসতা।

শরৎচন্দ্রের উপর ইহার চেয়ে বড় অবিচার হইতে পারে না। তিনি রিয়ালিষ্ট মোটেই নন। বাস্তব জীবনে আদর্শ নাই, ভাল কিছু নাই, আছে শুধু কদর্য্য বীভৎসতা, পাপের তাণ্ডবলীলা, এ কথা তিনি কোনও দিনই দেখান নাই, দেখাইতে চান নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে তিনি অনেক রোমান্টিক লেখকদের চেয়ে বেশী রোমান্টিক। যে সব চরিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, যে সব ঘটনা রচিয়াছেন সেগুলি এমন বাস্তব চরিত্র বা ঘটনা নয় যাহা আমরা সদাসর্ব্বদাই আমাদের চারিপাশে দেখিতে পাই। বাস্তব জগতে তা'রা আছে, কিন্তু তাদের খুঁজিয়া বাছিয়া লইতে হয়। তা'রা অসাধারণ, ঠিক যেন রোমান্টিক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা অসাধারণ। তাদের এই অসাধারণত্ব এই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, এবং এই অসাধারণত্বই তিনি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন নিপুণ তুলিকা-পাতে।

প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র মজ্জায় মজ্জায় রোমান্টিক। সাধারণ চল্‌তি জীবনের, চল্‌তি ভালমন্দের কোনও আকর্ষণ নাই তাঁর উপর—যেটা সাধারণ নয়, যাহা মামুলির বাহিরে, চল্‌তি মাপ-কাটি দিয়া যার পরিমাণ হয় না সেই জীবন, সেই কার্য্য, সেই ঘটনা তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করে—ঠিক যেমন রূপকথার রাজপুত্র বা রাজকন্যা শিশুচিত্তকে মুগ্ধ করে। তাঁর লেখার রস বাস্তব-চিত্রে নয়, অসাধারণত্বে। এ বিষয়ে রোমান্টিক লেখকদের সঙ্গে তাঁর বেশ সাদৃশ্য আছে।

শরৎচন্দ্রও রোমান্টিক, অসাধারণের উপাসক, কিন্তু সাধারণ রোমান্টিক লেখক হইতে তাঁর প্রভেদ আদর্শগত, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা-

গৃত নয়। রোমাণ্টিক লেখকগণ চলতি আদর্শের মাপে চরিত্র গৌরবের পরিমাণ করেন, শরৎচন্দ্র করেন তাঁর নিজস্ব একটি আদর্শ দিয়া। সমাজের চল্‌তি আদর্শে যাদের গৌরবের কোনও অধিকার নাই, তাদের ভিতর তিনি অসামান্য গৌরব দেখিতে পাইয়াছেন, সমাজের বিচারে যারা অবজ্ঞাত তাদের ভিতর তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন বীরধর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রকাশ। সেই বীরধর্ম্ম, সেই শৌর্য্য ও গৌরব যাহা প্রকাশ হইয়াছে সমাজের পরিভূত জীবনের স্তরে, যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন সব ছোট খাট কাজে, যাহা সমাজের চোখেই পড়ে না, যাহাকে রোমাণ্টিক সাহিত্যিক তাঁর জীবনচিত্তে গৌরবের অবসর বলিয়া গণনাই করেন না, সেই গৌরব, সেই সব অসংশয়িত-সৌষ্ঠব কর্ম্মের ভিতর যাহা লুকাইয়াছিল সমাজের অনধিগম্য গুহায়, তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন শরৎচন্দ্র, এবং তাহাকে তিনি মর্য্যাদা দিয়াছেন, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন গৌরবের সিংহাসনে।

Walt Whitman বলিয়াছেন যে Chivalryর যুগে বীরধর্ম্মের যে আদর্শ মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা এখনও লুপ্ত হয় নাই। বীরত্বের পূজা মানুষ এখনও করে; মধ্যযুগের Troubadornগণ যেমন করিত, আজকার সাহিত্যিকও তেমনি করেন। তফাৎ এই যে সেকালে লোকে পূজা করিত বর্ম্ম চর্ম্ম পরিহিত শৌর্য্যের, আজকার মানব শৌর্য্য দেখিতে পায় জীবনের ছোট খাট কাজ কর্ম্মে, সাধারণ লোকের জীবনে। শরৎচন্দ্রও ঠিক তাই করিয়াছেন। রোমাণ্টিক সাহিত্যিক যেখানে রত্ন অন্বেষণে গিয়াছেন কাটাখনির প্রশস্ত পথে,

শরৎচন্দ্র সেখানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন পথের পাশের অবজ্ঞাত ভস্মস্তূপে। কিন্তু সেই ভস্মস্তূপের ভিতর যে আকর তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহা অনর্ঘ মণিমাণিক্যের।

শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী নন, তিনিও রোমাণ্টিক, তাঁর চোখেও জীবন রঙিন্ হইয়া আছে আদর্শের রামধনুর রঙে—শুধু যে রঙে তাহা রঙিন তাহা বাজারের কেনা colour-box এর রঙ নয়, জীবন-স্রোতের রক্ত-রাগ। শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বাস্তবত্বে নয়, জীবনের আস্বাবের মূল্য নিরূপণে নূতন দর কষায়, গৌরবের পরিমাপে নূতন বাটখারার প্রয়োগে। শরৎচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তাহা Nietzchea ভাষায় Transvaluation of values, দরের হেরফের, যার ফলে যাহা ছোট ছিল তাহা বড় হইয়া গিয়াছে, যাহা অনাহূত ছিল তাহা গৌরবের আসন পাইয়াছে।

অপূর্ব্ব কলাসৌষ্ঠবের সহিত তিনি জীবনের দরকষায় এই নূতন নিকষমণি দেশের লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, খুলিয়া দিয়াছেন একটা সৌন্দর্য্য ও গৌরবের অজানা মণিকোঠা।

ইহাই শরৎচন্দ্রের সব চেয়ে বড় গৌরব।

কবি তিনি, কল্পনা-বিলাসী তিনি, চাঁদের পানে চাহিয়া তিনি তার ভিতর কারও মুখ না দেখিতে পারেন, কিন্তু জীবনের ছোট খাট তুচ্ছ জিনিষের দিকে চাহিয়া তিনি কবির দৃষ্টিতে এমন অনেক কিছু দেখিয়াছেন যাহা আর কেহ দেখে নাই। তাহাতেই তাঁর গৌরব, তাহাতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

শরৎচন্দ্র

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

সাহিত্য খেলা নয়, সৌখীনতা তো নয়ই। সাহিত্য জীবনেরই প্রকাশ আবার নবজীবনেরও ভিত্তি। বড় লেখক তিনিই যিনি দেন জীবন গড়ার উপাদান, আর তিনি ধন্য যিনি নিজে চোখ দেখে যান তাঁর দেওয়া উপাদান জীবন-গঠন কাজে লাগল।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা তাই ধন্য, কেননা বাংলাদেশে আজকের দিনে শরৎচন্দ্রের প্রভাব অপ্রতিহত, শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, বাঙ্গালীর জীবনেও। যাঁর প্রভাব শুধু literary নয়, নিছক সাহিত্যের গণ্ডী পেরিয়ে যাঁর লেখা দেশের জীবনধারার সঙ্গে এসে মিশেছে, সে-স্রোত যেখানে ক্ষীণ তাকে স্ফীত ক'রেছে, যেখানে অবরুদ্ধ তাকে নূতন পথে চালিয়ে গতি দিয়েছে, সে লেখকের দান ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দলাগার উপরে তো বটেই, সমালোচনার চুলচেরা বিচারও এ ক্ষেত্রে আর খাটে না।

শরৎচন্দ্রকে এখন আর যাচাই করা চল্‌বে না, তাঁকে মেনে নিতে হবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে হাজার হাজার বাঙ্গালী নরনারীকে তিনি আনন্দ দিয়াছেন। আর সে আনন্দ কেবল মুহূর্ত্ত-মাত্রের নয়, তা' গভীর, তাই বাঙ্গালীর জীবনকে তা' স্পর্শ করেছে, তার কথায় কাজে নিজেকে প্রকাশ করেছে, আবার কখনও বা তার চোখের ঠুলি দিয়েছে ছিঁড়ে, তার মনের বেড়া দিয়েছে ভেঙ্গে।

এইখানেই তাঁর শক্তি; তিনি বাঙালীকে যখন আঘাত করেছেন তখনও তার মন কেড়েছেন। জনপ্রিয় হবার জন্যে তিনি সত্যকে খাটো করেন নি। বাঙালার পল্লীকে তিনি সৌন্দর্য্য আর স্বাস্থ্যের আবাস ব'লে আঁকেন নি, বাঙালীর সামাজিক ব্যবস্থাকে অনাদি, অনন্ত, সনাতন মনে ক'রে কোথাও ভক্তি গদ্গদ হ'য়ে ওঠেন নি। লোকে যাদের বড় করেছে তিনি তাদের বড় বলেই সর্ব্বদা মেনে নেন্‌নি, যাদের লোকে করেছে ঘৃণা তারা সেইজন্যে যে তাঁর কাছেও ঘৃণিত হ'য়েছে তা নয়। লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত মানুষের ওমনুষ্যত্ব তিনি দেখেছেন, তাঁর প্রতিভা পাঁকেও পদ্ম ফুটিয়েছে!

অথচ তিনি জনপ্রিয়। এইটেই বিস্ময়ের কথা, এবং এইটেই আনন্দেরও কথা। যাকে ভালোবাসি না, তার কথাও আমরা শুনি না, ভালো কথা হলেও। শরৎচন্দ্রকে বাঙালী-ভালো বেসেছে, তাই তাঁর ভৎসনায় সে রাগেনি, সে লজ্জিত হয়েছে, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে, তার আত্মসর্ব্বস্ব সবজান্তা ভাব পরিহার করেছে, জগৎটাকে নূতন চোখে দেখতে চেষ্টা করেছে।

কি দিয়ে, তবে, তিনি দেশের মনোহরণ করলেন? আমার মনে হয় জনসাধারণ তাঁকে তাদেরই একজন বলে গোড়া থেকেই চিন্‌ল, তাই আত্মীয়তায় মধুর বন্ধনে অল্প সময়েই তাঁর কাছে ধরা দিল, তিনি যে-কথা বল্‌লেন তা' তাদেরই পরিচিত, ঘরোয়া জীবনের কথা, তারা দেখলে তাঁর পাত্রপাত্রী তাদেরই ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী। অপরিচিত কোনো বিশাল জগতের, বা অননুভূত কোনো বিরাট সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার আভাসে তাদের ধাঁধা লেগে গেল না।

তারা পেল তাদেরই আপন জীবন কাহিনী, সহজ ক'রে সরল ক'রে বলা। যে-সব মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, আবেগের বিশ্লেষণ তারা পেল, সে কোনো অসাধারণ সূক্ষ্ম মন নয়, তাই কোথাও তাদের কিছু অবোধ্য ব'লে ঠেকল না। যে অন্যায় ও অত্যাচারে তাঁর দেশবাসী নিত্যনিপীড়িত যুগসঞ্চিত যে ধূলিমালিন্যে তাদের সামাজিক ব্যক্তিজীবন অন্ধকার, শরৎচন্দ্র যখন তারই ব্যথা তাদের মনে নূতন ক'রে জাগিয়ে দিলেন, অসাড় মনও যেন সাড়া দিল। সুতরাং শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিপত্তি তাঁর একান্ত সাধারণত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণ অভিজ্ঞতাকে তাঁর প্রতিভা যেমন অপূর্ব্ব ক'রে তুলেছে, তাঁর ভাষাকে তেমনি করেছে বিষয়ের উপযোগী। এ-ভাষা যেমন সরল তেমনি সবল, যেমন স্বচ্ছ তেমনি মধুর। শব্দ বা বাক্যযোজনায় কোথাও কোনো চাতুরী নেই, চমকপ্রদ হবার চেষ্টামাত্র নেই; নূতন শব্দসৃষ্টি, কিম্বা লেখার কোনো অভিনব ভঙ্গী বা কায়দা কোথায় চোখে পড়ে না। প্রকাশের জন্য যেন কোনো প্রয়াস নেই, তাই বুঝতেও কোনো পরিশ্রম হয় না। তাঁর ভাষার পথে পদে পদে পাঠককে হোঁচট্ খেতে হয় না, সে-পথ দুর্গমও নয় বন্ধুরও নয়, যে চল্‌তে গেলে হ'তে হবে গলদঘর্ম্ম। এই অতি সহজ ভাষা লোকের হৃদয়ে তাঁকে অতি সহজেই প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

কিন্তু জনমনের মধ্যে প্রবেশ পাওয়া এক কথা, আর সেখানে চিরদিনের আসন পাতা আরেক কথা। শরৎচন্দ্রের বিষয় ও ভাষা তাঁর প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। প্রধান কারণ নয়। ও-গুলো তাঁর

পরিচয়পত্র, যা' দিয়ে লোকে জানল তিনি শত্রু নয় মিত্র, পর নয় ঘরেরই। কিন্তু আত্মীয়তার দাবী তিনি পাকা করেছেন তাঁর ভালোবাসা দিয়ে। তিনি যাদের কথা বলেছেন, যাদের তুচ্ছ জীবনের হাসিকান্নাকে তাঁর লেখায় অমরতা দিয়েছেন, তাদের যে তিনি শুধু জেনেছেন তাই নয়, তাদের তিনি ভালো বেসেছেন। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই এই সমবেদনা। যার মনের এই প্রসার নেই, এই সহজ ঔদার্য্য নেই, শ্রেণী বিশেষের বা জাতি বিশেষের উপর যার মনে নির্ব্বিচার বিরুদ্ধতা, সে আমাদের বিস্মিত করতে পারে বুদ্ধির উজ্জ্বলতায়, চমৎকৃত করতে পারে লিপি কৌশলে, কিন্তু কোনোদিন আমাদের মন তাকে আপন ব'লে, অন্তরঙ্গ ব'লে মানবে না। শরৎচন্দ্র বাংলা দেশের হৃদয় অধিকার করেছেন তাঁর এই সমবেদনা দিয়ে, মূঢ় দুর্ব্বল মানুষের প্রতি তাঁর এই অপরিসীম করুণা দিয়ে।

শরৎচন্দ্র

শ্রীজলধর সেন

পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান্‌ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বয়স ছাপ্পান্ন পূর্ণ হ'য়ে আজ সাতান্নয় পড়ল। এই শুভদিনে, শুভ উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য শরৎ-ভক্ত সাহিত্যিকগণ এই শরৎ-বন্দনার আয়োজন ক'রেছেন। এই উৎসবে যোগদান করবার জন্য এই রোগজীর্ণ বৃদ্ধকেও বন্দনা-সমিতি আহ্বান ক'রেছেন। তাঁরা যদি আমাকে আহ্বান নাও ক'রতেন, তা হ'লেও আমি, যেখানে থাকি না কেন ছুটে আস্‌তাম—আমি যে শরৎচন্দ্রকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি; এবং আর কারও চাইতে কম করিনে, এ কথা স্পর্দ্ধার সঙ্গে ব'লতে পারি। তাই আমি আজ এখানে উপস্থিত হ'য়েছি।

যিনি যখন শরৎচন্দ্রের কোন লেখা পড়েন, যেখানেই যে উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের কথা ওঠে, সেখানেই ত তাঁর বন্দনা-গীতি মুখর হ'য়ে ওঠে। তা হ'লেও আজ আর একবার, তাঁর এই জন্মদিনে বন্দনা-গীতি গাইতে হয়—এ আমাদের চিরন্তন ব্যবস্থা।

আজ ষোল সতের বৎসর ধ'রে 'শরৎ-সাহিত্য' সম্বন্ধে অনেক আলোচনা গবেষণা হ'য়েছে, এখনও হ'চ্চে, আজও হবে; অনেক বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদ হ'য়েছে, আরও হ'বে। দুইচার বার তুফানও উঠেছে। আমি নেপথ্যে দাঁড়িয়ে এ সবই সমভাবে উপভোগ ক'রেছি, এবং হাতে তালি দিয়ে ব'লেছি "বাহোবা, বাহোবা, বাহোবা

নন্দলাল!" আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দর, তার জয় হবেই,—শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রই থাক্‌বেন—নষ্টচন্দ্র হবেন না।

সুতরাং, শরৎ-সাহিত্য, তার সমালোচনা, তস্য সমালোচনা, বাদ-প্রতিবাদ, এ সকল থেকে আমি একেবারে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এ অবস্থায় আজ 'শরৎ-বন্দনায় আমি কি ব'ল্‌ব, তা প্রথমে ভেবেই উঠ্‌তে পারিনি। তারপরে মনে হোলো, সাহিত্য-রথী শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষ শরৎচন্দ্রের কথাই একটু বলি না কেন? তাই আমার এই প্রয়াস।

শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাক্‌তেন, তখন, এবং এখন যে রূপনারায়ণ-তীরে দুর্গম স্থানে আছেন, সেখানেও অনেক-সাহিত্যিকের সমাগম দেখেছি। আমাকেও প্রায়ই শরৎ-আলয়ে যেতে হোতো,—সাহিত্যা-লোচনার জন্য নয়, অন্য উদ্দেশ্যে, ও-সব আলোচনা আমার ধাতে সয় না। সেখানে দেখ্‌তাম, কেউ জিজ্ঞাসা ক'রছেন "হাঁ মশাই, আপনি কিরণময়ীকে পাগল ক'রলেন কেন? কেউ কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন "আপনি অন্নদা দিদির আর খোঁজ খবর নেননি কেন?" আবার হয়ত এক অর্ব্বাচীন প্রশ্ন ক'রলেন শেষ প্রশ্নের সমাধান কৈ?" ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নে শরৎচন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলছেন। আমি দূরে ব'সে প্রসন্নবদন শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে থাক্‌তাম, আর ভাবতাম এ লোকটার সহিষ্ণুতা কি অসীম!

ও-সব কথা থাকুক, অন্য কথা বলি। শরৎচন্দ্রের একটা কুকুর ছিল—তিনি বিলাতী নহেন, খাঁটি দিশী। তার নাম ছিল ভেলু। শরৎচন্দ্র কুকুরটার এ নামকরণ কেন ক'রেছিলেন, তা জানিনে।

কুকুরটী দেখ্‌তে ছিল কদাকার, আর তার আচরণ ছিল অতি অভদ্র। যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জ্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করত; শরৎ-দর্শন-প্রার্থীবৃন্দ ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থ দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন। ভেলুর গর্জ্জন শুনে শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্য থেকে যেই ব'ল্‌তেন "এই ভেলু!" আর অমনি ভেলু মেষশাবকের মত দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চ'ড়ে বস্‌ত। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কি ভালবাস্‌তেন, তা আর ব'ল্‌তে পারিনে। মনে হয় তাঁর শ্রীকান্তও রাজলক্ষ্মীকে অত ভাল বাস্‌তেন না। শুধু ভেলু নয়, সমস্ত জীবজন্তুর উপর শরৎচন্দ্রের যে কি টান ছিল এবং এখনও আছে, তা অনির্ব্বচনীয়।

সেই ভেলু একবার অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। বাড়ীতে যতরকম চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করালেন, দু'হাতে অর্থব্যয় ক'রতে লাগ্‌লেন। শেষে অনন্যোপায় হ'য়ে ভেলুকে বেলগেছিয়ার পশু-চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন—পাঠিয়ে দিলেন না। ভেলু যে কয়দিন সেখানে বেঁচে ছিল, শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বস্‌তেন; সারাদিন স্নান আহার ত্যাগ ক'রে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে থাক্‌তেন। রাত্রিতে যদি সেখান থাক্‌তে দেওয়ার আদেশ থাকত, তা হোলে শরৎচন্দ্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর ভেলুর পিঞ্জরপার্শ্বেই ব'সে থাক্‌তেন। কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না, তার মৃতদেহ শিবপুরে নিয়ে সমাধিস্থ ক'রলেন। আমি সংবাদ পেয়ে সেইদিনই শিবপুরে গেলাম। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্র আমাকে জড়িয়ে ধ'রে

কেঁদে উঠ্‌লেন "দাদা, আমার ভেলু আর নেই!" তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হোলো না। এই আমার শরৎচন্দ্র! এই শরৎচন্দ্রকেই আমি চিনি, আমি জানি। এই শরৎচন্দ্রকে আজ আমি বন্দনা ক'রছি!

আর একটী ঘটনার কথা বলি। শরৎচন্দ্র তখনও শিবপুরে বাস করেন। একদিন প্রাতঃকালে আমি শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম। সেদিন রবিবার। আমি প্রায় প্রতি রবিবারেই শরতের বাসায় যেতাম, সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত আটটা-নটার কলিকাতায় ফিরে আস্‌তাম।

সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশি ছোটবড় কলের ধুতি শাড়ী ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধ্‌বার আয়োজন করছে। শরৎ একখানি চেয়ারে ব'সে সুমুখের টেবিলে আনি তুয়ানি, সিকি গণে গণে গোছাচ্ছেন। আমাকে দেখে ব'ল্‌লেন "দাদা, আমি এই দশটার গাড়ীতে দিদির বাড়ী যাব। তা ব'লে আপনি চ'লে যাবেন না। যাবেন রাত সেই দশটায়।

আমি বল্‌লাম দিদির বুঝি কোন ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে। তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছ; আর কাঙ্গালী বিদায়ের জন্য ঐ আনি-তুয়ানি।

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "না দাদা, দিদির ব্রত প্রতিষ্ঠা নয়! এই ব'লেই সে চুপ ক'রল, আসল কথা গোপন করাটাই তার ইচ্ছা।

আমি বল্‌লাম "ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নূতন কাপড়ই বা নিয়ে যাচ্ছ কেন? অত সিকি তুয়ানিরই বা কি দরকার।"

শরৎ অতি মলিন মুখে ব'ল্‌লেন দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চা'র পাশের গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের যে কি দুর্দ্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সে যে কি—"শরৎ আর কথা ব'ল্‌তে পারল না; তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল।

এই আমার শরৎচন্দ্র! এই শরৎচন্দ্রকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি। এই শরৎচন্দ্রকে আজ আমি বন্দনা ক'র্‌ছি।

আশীর্ব্বাদ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শারদোৎসবে এই, যবে প্রতিনিমেষেই
আলো আর কালো চায় ঘেরিতে আকাশ,
তবুও কিরণমালা প্রসন্ন প্রকাশ
নিয়ে আসে আঁখি আর মনের সমুখে
যত কথা উদ্ভাসিত প্রকৃতির বুকে !
তুমি যে "নারীর মূল্য" বেদনার আনুকূল্য
দিয়াছিলে, অজ্ঞাত রাখিয়া নিজ নাম
বহু আগে ভোলে নাই তাই তার দাম
স্বদেশিনী যে যেথায় আছে। জন্মোৎসবে
জনে জনে স্নিগ্ধ মনে আনিয়াছে সবে
কেহ বন্দনার গীতি শুভ কামনার প্রীতি ;
আনন্দের আশীর্ব্বাদ অন্তরের স্নেহ,
তোমারে বন্দনা করি গাহিতেছে কেহ,
গাঁথি লয়ে সামছন্দে প্রীতির প্রশস্তি ;
কহিলাম সবাকার সাথে স্বস্তি স্বস্তি !
হোক শুভ আয়ু দীর্ঘতর,
কাম্যধন লভুক অন্তর।

১৯২৩ সালের ডায়রির কয়েক পৃষ্ঠা

শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রকে আমরা বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে পেলুম,—আকস্মিক আবির্ভাবের মত। তাব পূর্ব্বে 'যমুনা'য় তিনি দেখা দিলেও, বড় বড়দের দৃষ্টির বাইরেই ছিলেন। বোধ হয় সেকেলে পৌরাণিক (যমুনা) নামেব তেমন সাহিত্য-সম্মত প্রভাব ছিল না;—বিষয়ের নাম করণেও সেই পরিচয়ই দেয়,—হিমাংশুব নয়, জ্যোৎস্নার নয়—"রামের" সুমতি। পিতৃ-সত্য পালনার্থে নিশ্চয়ই বল্কল ধারণ ক'রে রাম বনে যাচ্ছেন। পৌবাণিক নয় তো কি?

পরে 'ভারতী' পত্রিকায় যখন "বড দিদি" মাসে মাসে দেখা দিতে লাগলেন, তখন লেখকেব খোঁজ পড়লো। প্রভাত বাবু রবি বাবুকে লিখলেন—'ভারতীতে' "বড় দিদি বলে গল্পটি পড়্ছেন কি? ইত্যাদি"—; এইবার বড়দের নজর পড়লো। পৌরাণিক 'যমুনা'রও খোঁজ পড়লো, তার আধ্যাত্মিকতা ঘুচলো।

মেয়েরা দয়া করলে গ্রহ কাটতে বিলম্ব হয় না, নব পর্য্যায়ের "বড়দিদি" ও "বিরাজবৌ" শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য-গগনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিলেন। তখন 'যমুনার' নমুনায় টান্ ধ'রলো। সমঝ্দারেরা বললেন—'বিন্দুর ছেলে' unrivalled, কেউ বললেন—'রামের সুমতি'র

জোড়া নেই! "যমুনা" এতদিনে ধন্য হ'লেন। আমার প্রথম পরিচয়-'পরিণীতার' সঙ্গে,—আমার পূজায় প্রথম অর্ঘ্য তাঁরই রইলো।

তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র আমাদের অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস দিয়েছেন। কিছু বোলে, তার প্রাপ্তি স্বীকার করাটা রীতি। কিন্তু যে পওয়াটা দেনা-পাওনা হিসেবের প্রাপ্য আদায় নয়—বরং তার বহু উর্দ্ধে, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যরূপে পাওয়া,—সেটিকে সানন্দে সকৃতজ্ঞ অন্তরে দান ব'লে স্বীকার ক'রতে হয়। আমিও আজ তাই কর'ছি। এতে ঋণ শোধের ফ্যাসাদ থাকলে, শাদার ওপর কালি চড়াতুম না! এ ঋণ অপরিশোধ্য। এ ঋণে সুখই আছে,—'দুঃখ ভাগিন্', হতে হয় না। এর পশ্চাতে বেয়াক্কিলে মুদী-মহাজন নেই।

এই টুক্‌রো টুক্‌রো কথাগুলিকে সমালোচনা ভেবে কেউ ভুল ক'রবেন না, আমি সমালোচক নই, সে স্পর্দ্ধাও আমার নেই। সমগ্র প্রাপ্তিটা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আত্মপ্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য।

সাহিত্য-রস প্রিয়রা তাঁর লেখা না পড়ে থাকতে পারেন না। কিন্তু সভা সমিতিতে বা সাধারণ্যে আজিও (১৯২৩) অনেকেই studiously নীরব। কেনো?

সহরের ও পল্লীর সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অর্জ্জন করা অভিজ্ঞতা, সেটা খেটে রোজগারের জিনিষ,—যখন ছাপার অক্ষরে পাকা-পাট্টার দাবী ক'রতে আরম্ভ ক'রলে, তখন ধীর-বিবেচক শ্রেণীকে চম্‌কে দিলে। তাঁরা বললেন—কথা ঠিক্ বটে, কিন্তু এ যে বড় হঠকারিতা হ'চ্ছে!

এই নতুন সুরটার মধ্যে ফাঁকি কি ভ্যাজাল বড় নেই। কিন্তু

কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা স্থির ক'রতে না পেরে, 'লিবারেলেরা'ও মুখ ফুটে কিছু ব'লতে ইতস্ততঃ করেন, কেবল লেখার ও শক্তির বাহবা দেন।

তবে অনেকেই মনে-জ্ঞানে জানলেন,—"এ সত্য,—এ জিনিষ আমাদের। এখন উত্তুরে ঠেকলেও এটা দক্ষিণে হাওয়া।"—তরুণেরা শরতাগমনে উৎফুল্ল! তাদের কাছে—"বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে।"

যুগটায় তখন এসে পড়েছে পশ্চিমের পড়'ন্ত রোদ্দুরের আলো। তাতে নতুন রংও ছিল, এবং নতুনের আকর্ষণও ছিল। তাই,—আমাদের উদয়ের দিক্‌টা 'রবির' অধিকারে দিয়ে, অনেকেই অনুকরণের নিয়ে পড়েছিলুম। শিক্ষিতদের চিত্ত পশ্চিমের প্রায় ভৃত্য হ'য়ে পড়্‌ছিল। এই ভয়ঙ্কর মানসিক পরিবর্ত্তনটা সহজেই দেশের মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনার বীজ ছড়াতে থাকে। আমাদের সাহিত্যও ভেতরে ভেতরে, জাত আর ধাত খোয়াতে আরম্ভ করে।

তাতে আমাদের ঘরে কথা নাম মাত্র থাকতো। যা থাকাতো তা ঠিক্ আমাদের দেশের, পল্লীর বা সংসারের কথা নয়,—কলকেতার কথা, কলকেতায় পালিস্ করা পোষাকী সমাজের কথা। সংসারের কথা নয়—স্বামী স্ত্রীর কথা। সাধারণের কথা নয়,—অসাধারণদের কথা। অধিকাংশই ছিল সময় কাটাবার উপলক্ষ্য,—তা থেকে মন বা দেশ বড় কিছু পাচ্ছিল না। সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'চ্ছিল না।

অবশ্য-ব্যতিরেক সকল ক্ষেত্রেই থাকে,—তাতে একটি উন্নতি-প্রয়াসী জাতির ক্ষুধা মেটে না, পুষ্টিও হয় না। সেরূপ দশ বিশখানি

বই যে আমরা পাইনি তা নয়। অল্প হ'লেও, তাই নিয়েই আমরা আনন্দ পাচ্ছিলুম, আলোচনাও ক'রছিলুম।

যে জিনিষটি ধীরে ধীরে ফোটে বা দেখা দিতে থাকে,—লোক তাকে ধীরে সুস্থিরে বোঝবার সময় পায়। যে নক্ষত্রটি বহুদিন ধ'রে লক্ষ্য করা হচ্ছে, তার গতিবিধির record, observation, সংগ্রহ করে' চলে। কিন্তু যেটি ধূমকেতুর মত সহসা এসে পড়ে, সে আপন জ্যোতিতে অন্যের চক্ষু ধাঁধিয়ে দেয়, প্রাণ মন চমকিত ক'রে দেয়, একটু ভয়ের সঞ্চারও করে। বিচারের সময় না পাওয়ায়, তার সম্বন্ধে কিছু বলাও কঠিন হয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অনেককে সেই অবস্থায় ফেলে দিয়েছে: উপন্যাসকে উপন্যাস ব'লে নিলেই হ'ত, কিন্তু অনেকে তা পারেন নি। কারণ তাঁর লেখাগুলো এতই জীবন্ত যে তাদের প্রাণহীন ব'লে উপেক্ষা করা কিছু কঠিন।

একেবারেই শুনলুম,—"লেখকটি খুব শক্তিশালী, লেখা বেশ ধারালো, খুব বড় লেখক।" কবে যে ছোট ছিলেন, তার কিন্তু record পাই না!

তিনি বড় কিসে? তাঁর উপন্যাসের বিশেষত্ব কি? এসব বড় ফ্যাসাদের কথা। আমি তাঁর সুরবালার মত বিশ্বাসী। বলি,—পড়তে ভালো লাগে, মন সুখ দুঃখ ভোগ করে,—আবার কি চাই? আমার সম্বল হৃদয়। কিন্তু মাথাওলা লোকে ছাড়বে কেনো, তাদের কারণ চাই, প্রমাণ চাই, সাইকোলজির সাড়া চাই। অকারণ ভালো লাগলেই তো হবে না!

দেখছি এতো যাচায়ের মুখে ছেলেটাকেও ভালোবাসা চলে না! তারা এখনি তাকে প্রমাণ করে দেবে,—পাড়ার পাপ!

তখন ভয়ে ভয়ে মাথা চুলকে,—যেহেতু আমার মাথাটা ওই কাজেই লাগে, ব'লতে হয়—শরৎ বাবুর লেখায়, বর্ণনা বাহুল্য বা অবান্তর কথা পাইনা। জিনিষটিকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে' দেখাতেও তিনি ত্রুটি করেন না। ব্যক্তব্যটি নির্ভীকভাবেই বলেন। কঠিন আর জটিল বিষয়ের সঙ্গে যেন শক্তি পরীক্ষা ক'রতেই তিনি ভালোবাসেন। যেটা তাঁর সত্য ব'লে ধারণা সেটা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণে তাঁর ইতস্ততঃ নেই।

Romanee না লিখে তিনি Novel লিখতেই মন দিয়েছেন। একটা জাতির,—সমাজ ও সংসার নিয়ে, লেখনি চালনা করা, আর সাপ নিয়ে খেলা করা, সমান কঠিন। কারণ—তার মধ্যে জাতির ভালো মন্দের সম্ভাবনা, আত্মগোপন করে' থেকে যায়, এবং নিজেকেও সেজন্য দায়ী থাকতে হয়।

অবশ্য অভিজ্ঞতা ও কল্পনাই লেখকদের মূলধন। এই দুয়ের সংমিশ্রনেই কথা-সাহিত্যের গড়ন চলে। এদের পরিমাণ রক্ষায় যিনি পারদর্শী তিনিই বোধ হয় ক্ষমতাশালী লেখক। শরৎ বাবু এগুলির ব্যবহারে খুবই সতর্ক, তাই তাঁর লেখায় উচ্ছ্বাসের উৎপাৎ খুবই কম। অনাবশ্যক খরচ নেই।

তাঁর ভাষাই তাঁর লেখার অলঙ্কার,—তার শক্তিই সর্ব্বত্র কাজ করে। 'ডায়েলগের' তিনি great artist. মতের মিল না থাকলেও, পাঠককে 'বাঃ' ব'লতে হয়।

শরৎ বাবুর 'শ্রীকান্ত' নাকি Romance. আমার মনে হয় ওটিকে তিনি বরাবর বাহাল্ রাখবেন, Close করবেন না। বড় লেখকদের অবসর বিনোদনের ওরূপ একটি "খোলা-খাতার" দরকার আছে। কত' খেয়াল মাঝে মাঝে উদয় হয়. ওটা তাদের guest house-এর কাজ দেয়। তারা ওইখানে আশ্রয় পায়। সব-কিছু নিয়ে, উপন্যাস লেখা চলেনা, অথচ তাদের ফেলে দিতেও প্রাণ চায় না। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা মাত্র। ভুল হ'তেও পারে।

উপন্যাস আর গল্প শেষ করবার একটা উপায়,—নায়িকার আত্ম-হত্যা; তা—জলে ডুবে হোক, গলায় দড়ি দিয়ে হোক্, বিষ খেয়ে বা আগুনে পুড়েই হোক্।

পূর্ব্বেই বলেছি,—শরৎ বাবু সহজটাকে যেন স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে চলেন। এটিকেও যেন On principle—তাঁর উপন্যাসে স্থান দেন নি। আত্মহত্যাটা কোনো অবস্থাতেই ভালো আদর্শ নয়। তাঁর মত শক্তিশালী, প্রিয় লেখক ওটাকে প্রশ্রয় দিলে, এ ভাব-প্রবণ দেশে, অনিষ্টেরই সম্ভাবনা ছিল।

তাঁর "বিলাসী" ব'লে, ছোট গল্পে ওই চাঁড়ালের মেয়েটি স্বামী বিয়োগে অনন্যোপায় অবস্থায় বিষ খেয়েছিল। গল্পটি বোধ হয় তাঁর বহু পূর্ব্বের লেখা, এবং আমাদের সমাজের বাইরের কথা। আর আছে কি না, ঠিক্ ব'লতে পারছি না,—বোধ হয় যেন ওইটিই প্রথম ও শেষ।

"ভারতবর্ষে" "অরক্ষণীয়ার" সমাপ্তি ওই ভাবেই ঘটেছিল এবং পাঠক মাত্রেই তা'তে ব্যথা বোধ ক'রেছিলেন। কিন্তু পুস্তকাকারে

"অরক্ষণীয়াকে" আর মরতে দেন নি। তা'তে principle বাঁচ্‌লেও উপন্যাস ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লে মনে হয়।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শরৎ বাবুর কাছে শুনেছিলুম,—"মেয়েদের মধ্যে ও-রোগ আর না বাড়ানই ভালো"—ইত্যাদি।

শরৎ বাবুর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসখানির 'কিরণময়ী' ও 'সাবিত্রী' চরিত্রের উপর অস্বাভাবিকত্বের আরোপ শুনতে পাই। এই স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক নিয়ে বড় বড় লেখকেরা অনেক-কিছু ব'লে গিয়েছেন। চরিত্র-সৃষ্টি স্থলে তাঁরা ওটাকে বিশেষ দোষের মধ্যে ধরেন নি; বরং বিশেষ-সৃষ্টি স্থলে একটু অস্বাভাবিকত্ব থাকাই উচিত বলেন। তাকে যে নূতন কিছু যোগাতে হবে। তাকে 'মিডিয়ম্' ক'রেই ত' লেখক কিছু দেবেন;—তাই তাঁকে সে চরিত্র সৃষ্টি ক'রতে হয়। তবে ষোলো-আনা সৃষ্টি ছাড়া না হ'লেই হ'ল।

কিরণময়ীর Smart intelligent যুক্তি, তর্ক, কথাবার্ত্তা, সত্যই আমাদের স্তম্ভিত ক'রে দেয়। এ সব সে পেলে কোথায়, আসে কোথা হ'তে,—সে সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের বধূ মাত্র!

এই চরিত্রটি ফোটাবার পূর্ব্বে শরৎবাবু তার যে back ground-এর চিত্র দিয়েছেন, সেটি একবার বিচার ক'রে না দেখলে, শরৎ বাবুর প্রতি অবিচার করা হবে।

মনুষ্য জীবনের ও রক্তমাংসের শরীরের স্বাভাবিক যা প্রাপ্য—প্রকৃতি; বৃত্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ, কিরণময়ী সই পেয়েছে।

রূপে যৌবনে সে ঢল্ ঢল্ ক'রছে। বিধিদত্ত ঐশ্বর্য্যের তার অভাব কই?

সেই ঐশ্বর্য্যময়ীর বধূজীবন,—কোথায় কি ভাবে কাট্‌ছে! দুস্থ সংসার, রুগ্ন স্বামী, শ্বাশুড়ির অনাদর, লোক চক্ষুর অন্তরালে, অন্ধকার গলির মধ্যে একটি এঁদোপড়া অপরিসর বাড়ী। যে বাড়িতে ভিক্ষুকও কখনো 'মা' ব'লে গিয়ে দাঁড়ায়নি, একটি কাক এসেও বসেনি।

খুব ছোট কথা। কিন্তু এরাও মানুষকে অলক্ষ্যে সাহায্য করে। জীবনের নির্ম্মম মুহূর্ত্তগুলিকে অবকাশ দেয়। জেলখানায়ও বন্দীরা মানুষ দেখতে পায়, বৈচিত্র্যের অবকাশ পায়। কিরণময়ীর কোন্‌টা ছিল?

রূপ যৌবনের সার্থকতা নেই আশা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নেই। তার রূপ, তার যৌবন, তার স্বাভাবিক আশা আকাঙ্ক্ষা, বন্দীভাবে কেবল অন্তরেই বেড়েছে, অলক্ষ্যে গুম্‌রে মরেছে। রুদ্ধ বিদ্রোহ প্রকাশের পথ পায়নি। বেদান্তের পাঠ তাকে শুষ্ক কাঠ বানিয়ে দিয়েছে, তার রসের সকল উৎসমুখ রোধ ক'রে—তাকে একদিন দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠবারই সাহায্য ক'রেছে, তার বিশ্বাসকে বিষাক্ত ক'রে দিয়েছে।

তারির পরিণামই আমরা পেয়েছি। রুদ্ধ প্রকৃতি তার পরিশোধ নিয়েছে। মহাশক্তি বাধা পেলে প্রণয়ই আনে।

কিরণময়ীর প্রখর intellectএ আশ্চর্য্য হবার কারণ তো দেখতে পাই না। বিদুষী শ্রীমত্যা সরযূবালা দেবীর 'বসন্ত প্রয়াণ' প্রভৃতি লেখায় যে সব সমস্যার সাক্ষাৎ পাই, তার মধ্যে প্রবেশ করাই কঠিন। সেজন্য আমার ক্ষমতাই দায়ী।

শরৎ বাবুর 'কিরণ' আর 'অভয়ার যুক্তি প্রাখর্য্য', পাঠককে ধাঁধায় ফেলে নির্ব্বাক্ ক'রে দেয়। তা উত্তীর্ণ হওয়াও সহজ নয়। তবে, যুক্তির হারজিতই সকল ক্ষেত্রে শেষ কথাও নয়। তাদের সৌন্দর্য্যটা উপভোগ করাই ভালো।

অভয়ার যুক্তি তর্ককে, বড় ব'লে নিলে,—সমাজ থাকে না। তবে, যে সমাজ প্রতিকারের পথ ভাবে না বা দেখায় না, এক তরফা নির্য্যাতনই যার বিধি, সে প্রাণ খুইয়েছে।

জঘন্য পশু প্রকৃতির পুরুষটাকে দেখেও হিন্দু সমাজ অভয়ার কাব্যে বাহবা দেবে না জানি, কিন্তু ওই অবস্থায় যে ওইরূপ ঘটনা ঘটে না বা ঘটতে পারে না, এত বড় মিথ্যা কথা কে বলবে! যে অবস্থায় যা ঘটা অসম্ভব নয়, লেখক তাই সর্ব্বসমক্ষে ধরে দিয়েছেন। বিষ গোপন করেন নি।

এইখানেই আমার 'ডায়ারি' শেষ।

এইবার আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শরৎবাবুকে নমস্কার সহ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি; আর প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ ক'রে—বঙ্গ ভারতীর ভাণ্ডার, নব নব উপন্যাস দানে সমৃদ্ধ ও শোভন করুন। আমি যেন ফিরে এসে—সে সব উপভোগ ক'রতে পাই। "শেষ" কথাটির সাহায্য নিয়ে আর আমাদের ভয় দেখাবেন না—সে পরিচয় সোত্তোরের পর দেবেন।

শরৎ-প্রশস্তি

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

জনগণমনোরঞ্জনে সখে কর নাই লেখনী ধারণ,
তথাপিও জনপ্রিয়, মানব হৃদয়ে তুমি পেয়েছ আসন !
তত্ত্বদর্শী, মনস্তত্ত্বে লভিয়াছ সাধনায় যেই অধিকার,
অপূর্ব্ব চরিত্র সৃষ্টি অবলীল ভাষা ভাবে সাহিত্যে তোমার।
বুকের বেদনা বুঝে লাঞ্ছনা কাতরে তুমি দিয়াছ সম্মান,
বাৎসল্য, প্রীতি, প্রেম, তোমার ও কথা শিল্পে অপরূপ দান।
দারিদ্র্যে অকুণ্ঠ তুমি, দরিদ্রের চিরবন্ধু স্বগণ বৎসল,
ত্যাগে অনুরাগী হ'য়ে করিয়াছ আপনারে মহান্ উজ্জ্বল !
সরল শিশুর মত, আকাশের তুল্য তব হৃদয় উদার।
ভাবের সন্ধান পেয়ে খুঁজিতেছ ভাবধারা অনন্ত বিস্তার।
যুগ সাহিত্যের ঋষি, দিবানিশি করিতেছ ধ্যান সাহিত্যের—
তা'রি মাঝে অহোরহ মাগিতেছ সিদ্ধমন্ত্রে কল্যাণ বিশ্বের।
আজিকে তোমার শ্রমে সাহিত্যের তপোবন কী শ্যামায়মান !
অনাচার অত্যাচারে সে শ্যামশ্রী নাহি টুটে দেখো ভগবান !

শরৎচন্দ্রের স্বরূপ

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের বড় দুর্দ্দিনেই আমরা শরৎচন্দ্রের দেখা পেয়েছি। খুব একটা ভরা ফলনের পর যেমন মাটি বা প্রকৃতি বিশ্রাম নেয়—একটা দীর্ঘ অনুর্ব্বরতার কাল চলে, বাঙালীর মেধা তেমনি বঙ্কিম ভূদেব আদির পর বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়ে কিছুকাল ঝিমিয়ে পড়েছিল। তখনো যে এ গাছে সুখাদ্য ফল একেবারেই ফলে নি তা' নয়, রবীন্দ্রনাথের সপ্ত-স্বরার দু' একটি তারে এক আধটুকু নতুন মীড় যে কেউ জাগায় নি তা' বলা যায় না। কিন্তু তাকে তো আর বড় সৃষ্টি বলে না, বীণাপাণির কমল-বনের ভোমরা তাঁরা হতে পরেন, কমলদলবাসিনী শ্বেতভূজার বরপুত্র তাঁরা নন।

ঋষি তাঁকেই বলে যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা; তাঁর মন্ত্র নিয়ে সেই মন্ত্রের শক্তিতে ভোজবাজীর মত একটা আন্‌চোরা নতুন যুগের সৃষ্টি হয়, যেখানে পথ সব বুঁজে এসেছে সেই দুর্লঙ্ঘ্য মরুর মাঝে পথ জাগে, তারপর সেই পথ বেয়ে চলে সারে সারে কাতার কাতার পণ্যবাহীর দল। গল্প তো সবাই লেখে, বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলার কথা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক জন্মেছে ভেরেণ্ডা কচু কালকাসন্দার মত; রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের যে ভরা গঙ্গা নামিয়ে এনেছেন তাতে আজ বাংলার—

> "শান্তিপুর ডুবুডুবু
>
> নদে ভেসে যায়।"

কিন্তু যখন প্রকৃত গুণী আসে সে হচ্ছে আর এক জিনিস! তখন বিস্ময় বিমুগ্ধ মানুষ স্তব্ধ হয়ে থাকে,—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
"আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবৎ কশ্চিদেনং শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেবং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥"

তখন সে আশ্চর্য্য মানুষটিকে দেখে মনে হয় ঠিক এমনটি বুঝি আর কখনও হয় নি আর কখনও শুনি নি, দেখি নি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন বড়মানুষ ও-পার থেকে চাপরাস নিয়ে আসে; একথা শুধু ধর্ম্মজগতেই সত্য নয়, সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে সঙ্গীতে সব ক্ষেত্রেই একথা খাটে।

"তোমার যারে হয় গো কৃপা
অরূপ তার রূপের ছটা,
কোমরে কৌপীন জোটে না
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।"

দেবতা বা ভগবান ঠিক আছেন কিনা আমরা জানি নে কিন্তু এ যে কারু পরম আশ্চর্য্য কৃপা, অন্ততঃ আমাদের নিগূঢ় জীবন দেবতার বরাভয়যুক্ত দুইটি কমল করের পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদের ফল তা'তে আর সন্দেহ কি? শরৎচন্দ্র ধনীর ঘরের দুলাল নন, তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মণিকারের বাটালীর কাটা রত্ন দূরে থাক একটা সস্তা পান্না চুণীও তিনি নন। শাস্ত্র ও সমাজ বড় বলে, সুশীল ও সুবোধ বালক বলে যাদের মাথায় তোলে তাও তাঁকে বলা চলে না। তবু তিনি তাঁর ললাটে একি রাজটীকা বীণাপাণির কোন্ হংস মিথুনের পালক

দিয়ে আপন হাতে এঁকে তুললেন, আর বিস্ময়মুগ্ধ বাংলা দেশের সঙ্গে সমস্ত ভারত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো ?

শরৎচন্দ্র হয়তো কবি ঠিক নন, কারণ ছন্দোবদ্ধ রসগর্ভ পদ তিনি কখনও লেখেন নি; রবীন্দ্রনাথ দূরে থাক সে রবির কিরণ পেয়ে বাংলার সাহিত্য গগনে যে সব বাঁকা শশির উদয় হয়েছে তাদেরও রাগ রাগিণী শরৎচন্দ্রের তারে হয়তো বাজেনি। তিনি হচ্ছেন চিত্রী বা কথা-শিল্পী, আমাদের সাহিত্যে রিয়্যালিজমের প্রথম বড় রূপদক্ষ ভাস্কর। জীবনের অলিগলির কত না চেনা বড় আপনার জনকে প্রাণ-দেবতার মত নিপুণ তুলিকায় অনুপম দরদ দিয়ে শরৎচন্দ্র জীবন্ত করে রেখে গেলেন। তাই ছন্দোবদ্ধ পদ না হলেও এ poem of life কবিতার হিসাবে বড় কম যায় না। পচা পাঁক থেকে নীরবে তিলে তিলে অনবদ্য পদ্মটিকে নিপুণ সূক্ষ্মতায় রূপে লাবণ্যে গন্ধে মধুভারে ফুটিয়ে তোলাই প্রাণদেবতাব কাজ, একটি তুচ্ছ ঝিনুক বা পাতাকেই সে দেবতা গড়ে কতই না সূক্ষ্ম বর্ণে কারুকার্য্যে নয়ন মঞ্জুল করে।

শরৎচন্দ্রও প্রাণের অপূর্ব্ব ও বিচিত্র ক্ষুধা তৃষ্ণার কবি, হৃদয়ের স্নেহ মমতা আদর অনাদর হাসি অশ্রুর গাঢ় প্রলেপে তিনি এঁকে গেছেন বাঙালীর ঘরের মা, দিদি, পত্নী, সখী, স্বামী, পুত্র, ভাই দেবরের প্রাণারাম ছবি। সে সৃষ্টি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত তেমনি সহজ ও অনায়াস, এই অনায়াস বৃহৎ সৃষ্টিই বড় শিল্পীর লক্ষণ।

আমাদের সাহিত্যকে নীতি ধর্ম্মের উপদেবতায় পেয়ে বসেছিল, ঠাকুরমার গল্পের মত পাপের শাস্তি আর পুণ্যের পুরস্কার ছিল অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসের গোবিন্দলাল রোহিণীদের আসল কথা। রাগ দ্বেষ

দোষ ত্রুটিকে আঁকা হতো নর্দ্দমার কালো পাঁক দিয়ে, তারা যে নিতান্তই আমাদের ঘরের মানুষ ও আপনার জন, আলো ও অন্ধকার এই দুই মায়ের কোলে যে আমরা মানুষ হচ্ছি সে দরদ ও সহানুভূতির পরশ এমন করে শরৎচন্দ্রের লেখায় ছাড়া আর কোথাও আমরা পাইনি। নীতিশাস্ত্র হয়তো খুব ভালো জিনিস, মানুষের মানস-কল্পিত যে সমাজ-ব্যবস্থা তাকে বাঁচিয়ে টিঁকিয়ে রাখতে খুব লম্বা টিকি এবং তিলকের হয়তো একদিন দরকার হয়েছিল। কিন্তু সে শাস্ত্র যখন তার অধিকার ডিঙিয়ে সাহিত্য ও কলার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে, তখনই সে ভূত বা উপদেবতা পদবাচ্য হয়। আমরা আমাদের মানস রাজ্যের এই আচার ও নীতি দৈত্যকে যে ভগবানের নামে চালাই তিনি কিন্তু এই কচকচি ও কোলাহলের অনেক উপরে থেকে অবাধে সমভাবে দু' হাতে গড়ে চলেছেন ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ সবই, কারণ এসবই যে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির উপকরণ।

নীতির বেড়া জীবেরই জন্য, শিবের জন্য নয়, আর সব স্রষ্টারই জন্ম হচ্ছে শিবাংশে, তাই তাদের রসময় আনন্দ লোকের খেলায় দেখতে পাই একটি উজ্জ্বল প্রসন্ন সমরস। মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতিকে শরৎচন্দ্র এঁকেছেন মায়ের স্নেহবিগলিত স্পর্শ দিয়ে, তাঁর লেখায় তাই মন্দের গাঢ়কৃষ্ণ মেঘের গায়ে ভালোর সোণালী কারুকার্য্য কি পরম শোভাই না ধরেছে।

"তমাল পাশে কনকলতা
হেরিয়ে নয়ন জুড়াল রে,
কিম্বা নব নীরদ বামে
দামিনী হেসে দাঁড়াল রে।"

শরৎচন্দ্রের আঁকা ভাল ছেলে মহিমের চেয়ে তাই চরিত্রহীন সতীশ ও কিরণময়ী আমাদের বুকের তন্ত্রীগুলি ধরে টানে বেশি। শরৎচন্দ্রও হয়তো অনেক ক্ষেত্রে মন্দকে দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলেছেন আর ভালোর হাতে তুলে দিয়েছেন জীবনের ঝকঝকে প্রাইজগুলি। কিন্তু সেখানেও আমাদের বুকটা ব্যথায় সহানুভূতিতে টন্‌টন্‌ করে তাঁর এই অবাধ্য চরিত্রহারা ছেলে মেয়েগুলির দরদে।

আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র এই দিক দিয়ে এক নতুন জগতের দেবদূত। মানুষের এতদিনের জীবনচক্র যে এবার পাল্টে যাবে, এতকালের শুভাশুভ, ভালমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণের মনগড়া দাঁড়িপাল্লায় যে আর কুলাচ্ছে না, মানুষের ধর্ম্ম নীতি সমাজ রাষ্ট্র যে আবার ফিরে যাচ্ছে তার বিধাতার হাতে কাদার নরম তালটি হয়ে—বুঝি নতুন কি এক রূপান্তর পাবার জন্য, একথা পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান যুগের অনেক খুব বড় বড় কথা-চিত্রীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শরৎচন্দ্রই বাংলায় প্রথম বলে গেলেন।

বাংলায় শরৎচন্দ্র মানবতার প্রথম ঋষি। মানুষ যে দেবতা না হলেও মানুষ হিসাবে নিজেই অনবদ্য ও অনুপম, কোন শাস্ত্র শ্লোক তন্ত্র মন্ত্র তার চেয়ে বড় নয়, তাকে নীতির অঙ্কুশ মেরে নরকের আগুনে তাতিয়ে পিটিয়ে টেনে টুনেও যে খুব বেশি বড় করা যায় না, একথা শরৎচন্দ্রের লেখনীতে যেমন ফুটেছে তেমন আর কোথায় ফুটেছে জানিনে। আমরা বহুদিন থেকে মানুষকে মানুষ বলে দেখতে ভুলে গেছি। মানুষেরই প্রতিভা থেকে যার জন্ম সেই বেদ বেদান্ত পুরাণ স্মৃতি যেদিন ভূতের মত মানুষের ঘাড়ে চাপলো এবং অপৌরুষেয়তার মেকী গর্ব্বে তাদের স্রষ্টা মানুষের কানে দিল হাত, সেই দিন থেকে মানবতার হ'লো

মৃত্যু। সেই দিন থেকে পুঁথিতাড়িত শ্লোকভীত আমরা মানুষ দেখতে ভুলে গেলাম, ক্রমশঃ তার জায়গায় দেখলাম হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মুচী মেথর, নয় শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ গোত্র, নয় রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণী, আর নয়তো হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টান এমনি একটা স্বকপোলকল্পিত কিছু।

এই ভূতে পাওয়া আত্মবিস্মৃত জাতিকে মানুষের দোষেগুণে অপরূপ কলঙ্কী পূর্ণশশীর ছবি প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন মানবতার পুরোহিত শরৎচন্দ্র। তিনি তাই সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক একটা দুর্জ্জয় বিপ্লবের পুরোহিতের আসনে উঠে বসেছেন। এ বিপ্লব সারা পৃথিবীতে নানা জাতির তরুণ ও চিন্তাবীরদের মাঝে আজ আসন্ন হয়ে আসছে, তারই বুঝি ঢেউ দিয়েছে আমাদের গঙ্গা ভাগিরথী পদ্মার কূলে কূলে শরৎচন্দ্রের দিকনিনাদী কণ্ঠে। এক অপূর্ব্ব মুক্ত স্বপ্রতিষ্ঠ মহা-মানবতার হবে অভ্যুত্থান, সেই শক্তির পদভরে আজ পৃথিবী টলমল।

নবীন চিরদিনই আসে গোড়ায় একটা ঝঞ্ঝা বা ধূমকেতুর রূপ নিয়ে। ক্রুদ্ধ শিবের চোখে যার জন্ম তার প্রথম রূপটা করাল ও সর্ব্বভূত না হয়ে যায় না। একটি নূতন মন্ত্রের টঙ্কার যার মাঝে আছে সে বাণী হচ্ছে কালীর হাতের অসি। "শেষ প্রশ্নের" কমলের মাঝে আমরা তার নগ্ন ফলার ঝিকিমিকি প্রথম ভাল করে দেখতে পাই। এ দেশের রাজশক্তি অন্যরূপ হলে সে অসি আজ বাংলার ভাব-জগতের গোটা আকাশটা চিরে ফেলতো।

শরৎচন্দ্রের মত যাঁরা মানুষের গ্লানি-মানুষের দ্বারা মানুষের চরম অপমান ও অধোগতির কথা প্রথম বলেছেন তাঁর সমগোত্র সেই টলষ্টয় গার্কী তুর্গেনিভ গোড়ায় হয়তো বুঝতে পারেন নি কি লোহিত জগদ্দাহি

রাগে একদিন উদিত হবে এই মানবতার নব ভানু। শিবনেত্রের এই ক্রোধ যে কত প্রখর হতে পারে তা আজ নব-রাশিয়ার নিরীশ্বর রূপ দেখে অনুমান করা যায়। শরৎচন্দ্রও তাঁর অপরাজেয় বিশাল হৃদয়ের অনুরাগ দিয়েই বলেছেন সমাজের অপকার ও ধর্ম্মের ত্রুটির কথা। তাঁর চোখে আগেই জেগেছে স্নিগ্ধ শুভ্র এক ভাবী নব উষার সচন্দন কাষায় বধূমূর্ত্তি, সে উষাবধূর প্রকাশের আগের কালরাত্রির প্রলয় সমারোহ তাঁর চোখে হয়তো পুরাপুরি পড়েনি। যে সমাজের কোলে পিঠে শরৎচন্দ্র মানুষ হয়েছেন, তার প্রতি কতকটা অন্ধ মমতা তাঁর মুক্তিবাণীকে বার বার ক্ষুণ্ণ করেছে হয়তো, কিন্তু হৃদয়ের রাজা শরৎচন্দ্র মমতা ও করুণাকে এড়িয়ে যাবেন কি করে?

কিন্তু একথাও সত্য যে শরৎচন্দ্র যে হঠাৎ দেশের তরুণদের কাছ থেকে এতবড় পূজা পেয়েছেন শুধু বড় ঔপন্যাসিক হলে তিনি তার সিকিও পেতেন কিনা সন্দেহ। মুক্তির ঋষি বলেই তাঁর শিরে আজ এত লাজ পুষ্প বর্ষণের সমারোহ। তাঁর জন্মোৎসব হচ্ছে আসলে মানুষের শৃঙ্খল মুক্তির মহোৎসব, মানবতার নব দিগ্বিজয়ের পূর্ণ জয়ন্তী।।

শরৎচন্দ্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বঙ্গের অঙ্গনতলে বাড়ে যে নিযুত নরনারী
খ্যাতিহীন কীর্ত্তিহীন অর্থহীন দুঃখ পথচারী
দুর্গতির অন্ধকারে, দুশ্চিন্তায় অবসন্নপ্রাণ,
চিত্ত লাগি' তবু যারা চিত্তেরে দেয়নি বলিদান,
তুমি তাহাদেরি তরে রচিয়াছ রসের ভাণ্ডার
অন্তরের মধুচক্রে ; অফুরন্ত সে সুধা-জুয়ার
জ্যোৎস্নার প্লাবন সম ভরি' দেয় প্রাণের ভুবন,
হে দীপ্ত শরৎচন্দ্র, আঁধারের হে অন্তরধন।
তুমি দেখায়েছ বন্ধু, ক্ষুদ্র যাহা, তুচ্ছ তাহা নয়,
বাহ্য আবরণ মাঝে মানুষের সত্য পরিচয়
অন্তরের অন্তরালে, প্রেমের নিভৃত নিত্যলোকে ;
বৃহৎ মহৎ নহে, যতই পড়ুক না সে চোখে !
বাণীহীন বেদনায় লুটে যারা প্রাণের মন্দিরে,
পরিচিত অবজ্ঞায়, বুকের লাঞ্ছনা বহি' শিরে,
তাদের মর্ম্মের কথা আরক্তিম দিগন্তের ভালে
ফুটায়ে তুলেছ বন্ধু, অপরূপ রূপরশ্মিজালে !
ধরণীর ঘরে-ঘরে বেদনার বাতায়ন খোলা,
স্নেহপ্রেম ভালোমন্দ নিত্য সেথা চিত্তে দেয় দোলা
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ; কত সত্য কত-না প্রমাদ
একত্র পশিয়া মনে ঘটায় অজ্ঞাত অপরাধ !
তোমার কিরণস্পর্শে হেরি তারি বৈচিত্র্যের সীমা,
চন্দ্রালোকে দীপ্ত যথা সিন্ধু হ'তে গোষ্পদ-গরিমা।
হে বন্ধু, অগ্রজ মোর, তোমারে কি জানাইব আর—
লহ অন্তরের শ্রদ্ধা, লহ প্রীতি, লহ নমস্কার।

শরৎ-বন্দনা

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

তখন নেহাতই ছোট ছিলুম যেদিন "চরিত্রহীন" নামে উপন্যাসখানা কি রকমভাবে হাতে এসে পড়েছিল। সে সময় উপন্যাস পড়ার নেশা না থাকলেও বইখানা যিনি লিখেছেন তাঁর নামটা একবার দেখে নিয়েছিলুম।

তারপর যখন উপন্যাস পড়তে স্বরু করলুম, তখন কেবলমাত্র এই লেখকের "চরিত্রহীন"ই পড়িনি, একে একে "গৃহদাহ," "শ্রীকান্ত" "বৈকুণ্ঠের উইল" প্রভৃতি, অবশেষে "শেষ প্রশ্ন"ও পড়লুম।

বই পড়ে এই মানুষটীকে দেখবার জন্যে সত্যই যে প্রাণের মধ্যে ব্যগ্র বাসনা জেগে উঠেছিল এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তারপর একদিন সামনাসামনি তাঁকে যখন দেখতে পেলুম, সেদিন তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে থাকতে পারিনি।

সে দিন মনে হয়েছিল—এতখানি শক্তি না থাকলে এত বড় সমাজটার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে চলে না। তাঁর মত দৃষ্টি নিয়ে দেশের মানুষের পানে কেউই চাই নি, তাঁর মত দরদ নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে নি, তাই এত কাল মানুষ মানুষকে চিনতে পারে নি, মানুষের তৈরী সাহিত্যের সহিত তাই অপূর্ণতাই থেকে গিয়েছিল, সাহিত্য সত্যকার রূপ ধরে মানুষের চোখের সামনে ফোটে নি।

এর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্য ছিল কেবলমাত্র সাহিত্য, সে যুগের

সাহিত্য কেবলমাত্র কল্পনার রঙ্গীন ইন্দ্রজাল দিয়ে ঘেরা থাকত। সেই অতীত যুগটাকে বঙ্কিমের যুগ বলা চলে।

বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অশেষ রকমে ঋণী এ কথা আজ কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। তিনি সাহিত্যের মধ্যে যা কিছু অশ্লীল কুৎসিত জিনিস ছিল তা ফেলে বেছে যে জিনিসটীকে দাঁড় করিয়েছিলেন সেইটাকেই আমরা প্রথম সাহিত্যের সৃষ্টি বলে উল্লেখ ক'রতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে অনেক কিছু দিয়ে সাজিয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি যাদের ছবি এঁকে গেছেন তারা ছিল সম্পূর্ণ কল্পনারই প্রতিমা, বাস্তবে তাদের কোন প্রয়োজন হয় না বলেই তারা আমাদের মনের পরে তেমন আধিপত্য বিস্তার ক'রতে পারে নি। তাঁর আয়েষা, তিলোত্তমা, কুন্দ, চঞ্চলকুমারী প্রভৃতি, নগেন্দ্রনাথ, ওসমান, জগৎসিংহ, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, যাদের তিনি আমাদেরই জন্যে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন, তাদের আমরা দেখেছি বাইরে হ'তে, তাদের পরিচয় পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। আমরা আমাদের মাঝে তাদের পাইনি, তাই তারা বাইরেই রয়ে গেছে, অন্তরে প্রবেশ ক'রতে পারে নি।

মানুষের যা কিছু সৃষ্টি, তার মাঝে মানুষের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার প্রয়াস যথেষ্টই র'য়েছে। মনের কল্পনা মানুষের একটী মাত্রই নয়—অজস্র, আর এর মধ্যে ভালো মন্দও হাজার হাজার র'য়েছে। এই ভালো মন্দ হাজার রকম বাসনাকে রূপ দেওয়ার জন্যে মানুষ আবহমান কাল চেষ্টাও করছে বড় কম নয়। যুগ যুগ ধরে

মানুষ তার অন্তরের আদর্শকে—তার সত্বাকে রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে চেষ্টা ক'রে আসছে, আর যুগ যুগ ধরে সকল দেশের মানুষ সেই বিরাট সত্বার কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছে, নিজেকে নমিত করেছে, নিজের বিশাল চাতুর্য্যে নিজেই মোহিত হ'য়ে ভক্তিনম্রচিত্তে পূজা ক'রেছে। কেউ হয় তো বিদ্রূপও ক'রেছে—চেতনাহীন জড়ের পূজার সার্থকতা কি? কিন্তু মানুষ দার্শনিকের কথায় কাণ দেয় না, কারণ সে মানুষই, এই মাটির পৃথিবীকেই সে ভালোবাসে, একে ঘিরেই তার স্বপ্নজাল বিস্তৃত হয়। মানুষ তাই পূজা করে নিজেরই স্বপ্নকে, কল্পনাকে, যে পূর্ণতাকে সে পায় নি সেই পরিপূর্ণতাকে।

রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট বদ্‌লে চলছে, একটা দৃশ্যই বারবার দেখানো চলে না, নূতন নূতন দৃশ্যপটের আবশ্যক। মানুষের দৃষ্টিক্ষেত্রেরই শুধু পরিবর্ত্তন ঘটে নি, মনের বিকাশ ও হয়েছে, এখন ভাঙ্গা গড়ার সময় ক্রমবিকাশ চাই, একই দৃশ্যে মানুষ খুসি হ'য়ে থাকতে চায় না। পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও ঢের পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে, মানুষও তার স্বপ্নকে তাই সফল ক'রে দেখতে চায়। হাজার শিকলের বাঁধন তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না, কারাগারে ব'সে সে নীল আকাশের কোলে উড়ে চলে। গত যুগের স্বপ্ন আজ দিগন্তে লীন হয়ে গেছে, বর্ত্তমান যুগ আজ বিজয় নিশান তুলে এসেছে।

মানুষকে টুকরো ক'রে দেখা চলে না, তাতে তার অনেকটাই বাদ দেওয়া হয়। বঙ্কিমের যুগে গোটা মানুষটাকে কেউ দেখে নি, তার বাইরের দিকটা নিয়ে সাহিত্যিকও চলেছিলেন; আজ সেই অপরিপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করতে মানুষের ডাকে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছেন মেঘ

ভাঙ্গা নীল আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র। অন্ধকার তার ভীষণতা নিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছে, শরৎচন্দ্রের আলো আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ ক'রে সব শুভ্র আলোয় ভরিয়ে তুলেছে।

সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসন সব সময়েই ছিল, এখনও আছে। সমাজ চিরদিনই মানুষকে চোখ রাঙিয়ে আসছে, মানুষকে লক্ষ নিয়মের নিগড়ে বেঁধে জর্জ্জর ক'রে তুলছে। মানুষের এতটুকু ত্রুটী অমার্জ্জনীয়; মানুষের অন্তর মূক হয়ে থাক, নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাক, সমাজ চায় তার বাইরের নিয়ম বজায় রাখতে।

মানুষ বরাবরই তা জানে, কিন্তু এমন ক'রে মুক্ত ফুটে জোর গলায় কেউ তো ব'লতে পারে নি—মানুষের অন্তরটাই আসল, কেবল বাইরেটা নিয়ে কাজ চলতে পারে না। আঘাতে আঘাতে অন্তর নির্জীব হ'য়ে প'ড়েছে তাকে সঞ্জীবিত করা দরকার, সে অন্তরের উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া দরকার। এমন জোরের কথা আমরা শুনেছি শরৎচন্দ্রের অভয়া, কিরণময়ী কমলের মুখে যারা মানুষকে সত্যকার মর্য্যাদাই দিতে চায়, গোপন অনেক কথা অনেক বেদনা যারা উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে।

বিসুভিয়াসের বুকের তলায় হাজার বৎসরের আগুন জমে থাকে, একটা দিনে সে ক্লেদ সে বার ক'রে ফেলে, কত জনপদ তার ধাতু নিঃস্রাবে ভুষ্ট হয়, কত লোক মরে। বাংলার বুকে হাজার হাজার বৎসর ধরে লক্ষ নরনারীর বুকে তেমনই আগুন জমে ছিল, তারা এমন একজন কাউকে চেয়েছিল যিনি এসে তাদের ব্যথা প্রকাশ ক'রবেন, এই অচল অনড় সমাজকে নাড়া দিয়ে এর মধ্যে যত ক্লেদ, যত আবর্জ্জনা জমে আছে সব প্রকাশ ক'রে দেবেন।

মূক নরনারীর নীরব আবেদন যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছেচে, তাদের ডাকে আজ বাংলার আকাশে শরৎচন্দ্রের পূর্ণ বিকাশ হ'তে দেখেছি। দরদী বন্ধু প্রকৃত দরদ দিয়ে এই সব মূকদের বেদনা লেখনীর মুখে ফুটিয়ে চলেছেন।

সাহিত্যের সৃষ্টি প্রথম যুগে হ'য়েছিল কল্পনার পরে, বিরাট বিপুল অট্টালিকার মাঝে, প্রচুর অর্থ সম্পদ ও সম্মানের মাঝে। ক্ষুদ্রের পানে কেউ চায় নি, মনের ব্যাপারটাকেও মানুষ সর্ব্বপ্রযত্নে বাদ দিয়ে গেছে।

আজ যে মানুষটী সত্যকার সাহিত্যের মধ্যে মানুষের সত্যকার রূপটী ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁকে সত্যই অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন না ক'রে থাকতে পারা যায় না। বাংলার সত্য যেন ঘুমিয়েছিল, এই কুহকী তাঁর জীয়নকাঠির স্পর্শ দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলেছেন, মানুষ নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবতে শিখেছে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাঁরই মতের মত সত্য, শুভ্র। এ তো স্বপ্ন পুরীর রাজকন্যা নয় যাকে কেবল দূর হ'তে দেখাই যায়, স্পর্শ করা চলে না। স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার সৌন্দর্য্য অসীম, মাধুর্য্য অসীম, অথচ তার মধ্যে প্রাণ নেই, অনুভূতি ও তাই তার মধ্যে নেই। মানুষকে সে মুগ্ধ ক'রতে পারে ক্ষণিকের জন্য, চিরস্থায়ী রেখা কাটবাব ক্ষমতা তার নেই—কারণ সে কাল্পনিক।

শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রতে নামে যে লোকে কেবল দূর হতে তাদের দেখবে! শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকা নিত্যকার, চিরন্তন হাসি কান্নার ধারায় স্নাত হ'য়েই চলেছে। তারা

আমাদেরই মত সমাজের পেষণে নিষ্পেষিত হয়, আমাদেরই মত সুখ দুঃখের কথা বলে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

সত্য চিরদিনই সত্য, আর সেই জন্যেই তার মত সকলেই মানতে বাধ্য হয়। শরৎচন্দ্র সত্যকে পেয়েছেন তাই আজ বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হ'য়েছে, তাঁদেরই কল্যাণের জন্য তিনি নিজে দাঁড়িয়েছেন, সমাজের চোখ রাঙানী তাঁকে এতটুকু দমাতে পারে নি।

মানুষের মন চিরদিন সত্য সুন্দরকেই চেয়ে ফেরে, অসুন্দরের পানে চোখ পড়লে সে চোখ ফিরায়। আলোর ভিখারী মানুষ আলোর সন্ধানে ছুটেছিল, অন্তর দেবতার উদ্বোধনে পুরোহিত তার সামনে আলো ধ'রে দাঁড়িয়েছেন, শিল্পীর হাতে সত্যসুন্দরের রূপ দ্বিগুণ ফুটে উঠেছে, জটিল মনস্তত্ত্ব আজ সরল হ'য়েই দেখা দিয়েছে।

এ সাহিত্যের সৃষ্টি সত্যের মধ্যে—বেদনার মধ্যে। কণ্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে তিনি আমাদের কাছে এসেছেন, তাঁর পায়ে, সারা গায়ে কত কাঁটা বিঁধেছে, এখনও বিঁধছে, অথচ সে দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। সমাজের শাসনে নিপীড়িত নরনারীর দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে, তিনি সেই জন্যেই অভয় সাহস ও শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মানুষের ডাক আজ সার্থক হ'য়েছে, সে তার দরদী বন্ধুকে পেয়েছে। এ বন্ধু তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে, স্বপ্নকে সত্যে পরিণত ক'রেছে, সত্তাকে রূপে বিমণ্ডিত ক'রে ফুটিয়ে তুলে দেখিয়েছে এই চিরন্তন, এই সত্য, এই মানুষের প্রতীক।

শরতাকাশে পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক, আকাশ মেঘমুক্ত সুনীল হ'য়ে যাক। যে পুরোহিত আজ আলো ধ'রে মন্দির

দ্বারে দাঁড়িয়েছেন, আমরা আজ ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করি। আমাদের জীবনে এমনই শরৎকাল বার বার আসুক, মেঘমুক্ত নীল আকাশে আমরা যেন প্রতি বৎসরই শরৎচন্দ্রের উদয় দেখতে পাই, তাঁর শুভ্র আলোয় আমাদের ঘরের অন্ধকার কোণ গুলোও যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে।

শরৎ-দাদা

শ্রীকালিদাস রায়

সত্যের মহিম্নঃস্তবে বৈতালিক হে পিকচারণ
নবীন-যুগের ঊষা তব কণ্ঠে লভিল বরণ,
বঙ্গের গহন আর্ত্তি আরক্ত ক'রেছে তব চোখ,
তাহার বক্ষের ক্ষতে প্রীতিভরে বুলালে পালখ।
অন্তরের পর্ণঘন গূঢ়কুঞ্জে তোমার কুলায়,
মুকুলমোদিত গীতি সব জ্বালা বেদনা ভুলায়,—
এমনি কতই কথা বলা যায় মিল দিয়া দিয়া
মসৃণ মামুলী বুলি বাড়ালেই যাইবে বাড়িয়া।
বিরক্ত হ'য়েছ তুমি শুনে শুনে ও শ্রেণীর কথা,
আমরাও তুষ্ট নহি। প্রকাশিতে প্রাণের বারতা,
পারিনিক কিছুতেই ছন্দোবন্ধে। করিয়াছি জড়ো
কত সংজ্ঞা বিশেষণ—উপনাম কত বড় বড়
কিছুতে বুঝায়ে বলা হয়নিক প্রশস্তিবাচনে,
কত বড় রসশিল্পী তুমি গুণি,—ছন্দের বাঁধনে
হয়ত চলে না বলা। মিটাইয়া রসের পিপাসা
কি আনন্দ দিলে তুমি প্রকাশিতে নাহি পাই ভাষা।
কথামৃত দিলে তুমি দিয়া মৃত কথা রাশি রাশি
আমরা শোধিব ঋণ ? সে কথা ভাবিতে পায় হাসি।
নিঃসঙ্কোচে প্রাণ খুলে তোমারে বলিতে পারি দাদা
বুঝিনা কি আর দেব এর বেশি তোমারে মর্য্যাদা।

শরৎ সাহিত্যে বাৎসল্যরস

রাধারাণী দেবী

বাংলা সাহিত্যে বাৎসল্যরসের প্রাণস্পর্শী চিত্র শরৎচন্দ্র যেমন এঁকেছেন, এর আগে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও সাহিত্যিকের লেখনী এমন জীবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শীভাবে এ রসটি ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। বঙ্কিমসাহিত্যে আমরা বাৎসল্যরসের গভীর স্পর্শ কোনোখানে পাই না।

বৈষ্ণবসাহিত্যে মধুর রসের পরই বাৎসল্যরস স্থান পেয়েছে। বাল-গোপালকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ বাৎসল্যরসকে অতি অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈষ্ণবসাহিত্য বাদ দিলে দেখা যায়, এত বড় একটা শ্রেষ্ঠ রস বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিশেষতর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ এবং ঐন্দ্রজালিক রসশিল্পী শরৎচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের বৌ ঠাকুরাণীর হাটের খুড়া বসন্ত রায়, ছোট গল্পের কাবুলীওয়ালা, গোরা'র আনন্দময়ী, ঘরে বাইরের কিশোর অমূল্যের দিদি বিমলা প্রভৃতি বাৎসল্যরসের অন্তঃস্পর্শী চিত্র।

শরৎসাহিত্যে সকল প্রকার বিভিন্ন রসই তাদের আপন আপন বিশেষত্ব ও স্বরূপ নিয়ে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হ'য়েছে। বাৎসল্যরসের ছবি তার অন্যতম।

কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র প্রথম আবির্ভূত হ'ন্ বাৎসল্যরসেরই দুর্লভ অমৃতপাত্র হাতে নিয়ে। 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'

গল্পে সকল দেশের ও সকল কালের জননী-হৃদয়ের বাৎসল্যরস অতি মহনীয় এবং মর্ম্মস্পর্শীভাবে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে ;—যা' চিরন্তন ও বিশ্বজনীন।

আমরা শরৎসাহিত্যের একাধিক স্থানে এই বাৎসল্যরসের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখেছি বিভিন্নতর নরনারীর প্রকৃতির মধ্যে। ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিতা উদ্ধতা প্রখরভাষিণী বিন্দুর দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ ও উত্তেজনা-প্রবণ প্রকৃতির কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না ঘটতে দেখি এই কোমল-রসের কমলস্পর্শে। যে সময়ে তার মা হওয়ার কথা, তখনও তার মাতৃত্বের অমৃত-অনুভূতি লাভ হয়নি। অথচ তেজস্বিনী মুখরা অভিমানিনী বিন্দুর সকল দোষ ত্রুটীর অন্তরালে অন্তরে ছিল একটি অপরিসীম মমতাময়ী স্নেহকোমলা মা। তাই বাইরের বিন্দুর সাথে ভিতরের বিন্দুর আগাগোড়াই বৈষম্য। সে যাদের ভালবাসে তাদের আঘাত করে, সময়ে সময়ে সে আঘাত হয়তো অতি কঠিনতমও হ'য়ে ওঠে! পরক্ষণেই তার প্রত্যাঘাতের নিদারুণ বেদনা সে নিজেই ভোগ করে অতি মর্ম্মান্তিক ভাবে।

বড়জা অন্নপূর্ণার দাসী রাঁধুনীকে মধ্যস্থ মেনে কথা কওয়ার বিরুদ্ধে যে আত্মমর্য্যাশীলা বিন্দুকে স্পষ্ট ভাষায় তীব্র ঘৃণাপূর্ণ প্রতিবাদ করতে দেখি, সেই বিন্দুই যখন অমূল্যর বিচ্ছেদে কাতর হ'য়ে অশ্রুসজল চ'খে সে-ই দাসী কদমের কাছে এবং সেই রাঁধুনীর কাছেই নিজের নির্দ্দোষিতার সমর্থন ভিক্ষা করে, তখন অতি পাষাণেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারে না। এইখানেই শ্রেষ্ঠশিল্পীর অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল!

২। 'রামের সুমতি' গল্পে মাতৃহীন দুরন্ত দেবর রামের প্রতি বৌদিদি

নারায়ণীর নিবিড় বাৎসল্য স্নেহের ছবি, জননী জাতিকে মাতৃত্বের প্রকৃত গৌরবময় মহান্ মর্য্যাদা দান ক'রেছে।

আপন গর্ভজাত সন্তানকে ভালবাসা নারীর সহজ প্রকৃতি। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও গর্ভজ সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। জগতে মাতৃস্নেহকে চিরদিন সর্ব্বত্রই খুব একটা উচ্চস্থান দেওয়া হ'য়েছে। স্বার্থ-সংকীর্ণ সংসারে মাতৃস্নেহ নিঃস্বার্থ ও স্বর্গীয় ব'লে অভিহিত। কিন্তু বিচার ক'রে দেখলে মাতৃস্নেহকে ঠিক স্বর্গীয় বৃত্তি বলা চলে না, বরং মর্ত্ত্যেরই নিতান্ত সহজ ও সাধারণ গুণ বলা যায়। নিঃস্বার্থ বলার স্থলে মাতৃস্নেহকে বরং বিশেষভাবে স্বার্থ-বিজড়িত বলাই উচিত মনে হয়।

নিজের শরীর হ'তে উৎপন্ন সন্তানের প্রতি মায়ের যে অপরিহার্য্য আকর্ষণ ও স্নেহাশক্তি, সেটা সৃষ্টির নিয়মাধীন নিতান্তই জৈব ধর্ম্ম মাত্র। তার মধ্যে নারীর বিশেষ কোনও মহান্ গুণ কিম্বা ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্তঃকরণের বিশালতার ও প্রকৃত কোমলতার উচ্চ পরিচয় তখনই আমরা পাই, যখন দেখি সে নিছক্ পরের সন্তানকেও পরিপূর্ণ বাৎসল্যে জননী-হৃদয়ের অপরিসীম মমতায় একান্ত আপনার ক'রে নিয়ে ভালোবাস্‌ছে। তার মাতৃ অন্তরের স্নেহ প্রবণতার মহৎ সত্য তখনই নির্দ্ধারিত হ'য়ে থাকে যখন সে রক্তগত আকর্ষণ ও নাড়ীর টানের গণ্ডী উত্তীর্ণ হ'য়ে চলে।

অনেকস্থলেই দেখা যায় আপন গর্ভজ সন্তানের প্রতি তীব্র স্নেহ নারীকে অধিকতর স্বার্থপর ও সংকীর্ণচিত্তই ক'রে তোলে। নিজের সন্তানের স্বার্থ ও সুখসুবিধার জন্য অপরের সন্তানের প্রতি স্নেহ

বিমুখতা, এমনকি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দিতে বহু জননীকেই দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মাতৃস্নেহ, সন্তানের কাছে ব্যক্তিগত জীবনে যত বড়ই হোক না কেন, বিশ্বদেবতার ধর্ম্মাধিকরণে এর মূল্য কত খানি বলা কঠিন নয়। কারণ, এই জৈবধর্ম্মী সন্তান স্নেহ ক্ষুধা তৃষ্ণা কিম্বা কামক্রোধেরই মত মানব প্রকৃতিজাত সহজ বৃত্তি।

যে বাৎসল্যস্নেহ দেহগত সম্বন্ধের গণ্ডী উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে, যা' রক্তের সম্বন্ধ, নাড়ীর সম্বন্ধ ও স্বার্থের সম্বন্ধের সীমার মধ্যে বদ্ধ নয়, সেই নির্মুক্ত অনাবিল বাৎসল্যরসের প্রাণস্পর্শী চিত্র আমরা শরৎ-সাহিত্যে চিত্রিত দেখি। জগতের যে কোনও সাহিত্যে এর অনুরূপ সৃষ্টি বিরল ব'ললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবেনা।

শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' সংসারে উদার ও মহান্ মাতৃস্নেহের নিখুঁত-ছবি। নিঃসম্পর্কীয় মাতৃহীন কালো কুৎসিত দরিদ্র বালকের প্রতি হেমাঙ্গিনীর একান্ত নিবিড় স্নেহ এবং তার জন্য জ্ঞাতি পরিজন, এমন কি স্বামীর কাছে পর্য্যন্ত লাঞ্ছনা স্বীকার, সাহিত্যে বাৎসল্যেরসের

'মেজদিদির' এই নিঃস্বার্থ মমতা-প্রবণতার মধ্য দিয়ে শিল্পী বিশ্বের মাতৃজাতিকে মহৎ ক'রে তুলেছেন। ললিতের মা হেমাঙ্গিনীর একান্ত দুর্লভ মাতৃহৃদয়ের অসামান্য চিত্র ও পাঁচুগোপালের মা কাদম্বিনীর স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ মাতৃহৃদয়ের অতি সাধারণ ছবি তিনি তাই পাশাপাশিই এঁকেছেন। 'পল্লীসমাজের' স্নেহময়ী 'জ্যাঠাইমা'-কে কেউ ভুলতে পারে কি? মাতৃত্বজনিত স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল চিত্র দেখি শ্রীকান্তে। সমাজের হৃদয়হীন নিয়মচক্রে ও নিয়তির দুর্নিবার

নির্দ্দেশে 'রাজলক্ষ্মীকে' পিয়ারী'তে পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'য়েছিল। রাজলক্ষ্মীর পিয়ারীতে রূপান্তরিত হওয়াটা তেমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কারণ, সকল দেশের সকল সমাজেই মেয়েদের জীবনে ঐ ট্র্যাজেডি যথেষ্ট ঘটেছে এবং আজও ঘটছে। বিস্ময়কর বোধহয় *'পিয়ারী'র পুনরায় 'রাজলক্ষ্মী' রূপপরিগ্রহটাই।* মনে হয়, রাজলক্ষ্মী নিজেকে এক দিন 'বঙ্কুর মা'র আসনে স্থাপিত করেছিল ব'লেই তার আবাল্যের প্রেমাস্পদকে আপনার সন্নিকটে একান্ত ভাবে পেয়েও নিজেকে একদিন একটি মুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বল হ'তে দেয়নি। তার এই সুদৃঢ় সংযম এক্ষেত্রে অটুট ও অব্যাহত থাকতে হয়তো পারতনা যদি সে 'বঙ্কুরমা' না হ'ত। বঙ্কুর মাতৃত্বই তাকে তার জীবনের সঙ্কট মুহূর্ত্তে সংযমের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছে ব'লে মনে হয়। ।৫।

শরৎ-সাহিত্যে

বাৎসল্যরসের দৃষ্টান্ত শুধু যে নারীচরিত্রেই পরিস্ফুট হয়েছে তা' নয়, বহু পুরুষ চরিত্রের মধ্যেও এর রূপায়ন অতুলনীয় ও অনন্যপূর্ব্ব।

'বিরাজবৌ' গল্পে নিঃসম্বল নিরন্ন নীলাম্বরের গোপনে ছোটবোন হরিমতীর শ্বশুরালয়ে সুন্দরী ঝিয়ের হাতে শারদীয়া পূজার শাড়ী পাঠানো এবং বড় লোক কুটুম্বেরা অপমান ক'রে কাপড় ফেরৎ পাঠাবার পরও বিরাজবৌকে লুকিয়ে সুন্দরীর বাড়ী গিয়ে ছোট বোনটির কুশলসংবাদ লওয়ার ছোট্ট চিত্রটুকু সন্তান-স্নেহাতুর নরনারীর হৃদয়কে গভীর ভাবেই স্পর্শ করে। ৬।

তারপর, 'চন্দ্রনাথ' বইয়ের 'কৈলাস খুড়া'। বাৎসল্যরসের এতবড় মহান্ ও বিচিত্র ছবি আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও আছে কিনা

জানিনা। বালক বিশুর সাথে এই বৃদ্ধ শিশুর অকৃত্রিম অবাধ হৃদ্যতা ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব বাৎসল্যরসের একটি অভিনব ছবি।

যে বৃত্তি মানুষকে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করে তা' যতই উচ্চ কিম্বা কোমল বৃত্তি হোক্‌না, শ্রদ্ধেয় নয়। বাৎসল্য মানব হৃদয়ের একটি মহান্‌ ও সুকুমার বৃত্তি। কিন্তু সেই খানেই তা' শ্রদ্ধেয় যেখানে সে যথার্থই মহৎ ও উদার, আপনার সহজকারুণ্যে নিঃস্বার্থসুন্দর।

নিরাশ্রয়া দুঃখিনী সরযূকে স্বগৃহে আশ্রয় দানের সময় আমরা কৈলাস খুড়ার যে উদার বাৎসল্যের পরিচয় পাই, তা' নিঃস্বার্থ, নিস্পৃহ ও মহান্‌। কর্ত্তব্যজ্ঞানের শুষ্ক নীতিবোধ মাত্র এ নয়। সরযূকে কৈলাস খুড়া কর্ত্তব্যনীতির দিক থেকে কতটুকু অনুপ্রাণিত হ'য়ে আহ্বান ক'রে নিয়েছেন জনিনা, অন্তঃকরণের দিকের অনুপ্রেরণাতেই যে তাকে দু'বাহু বাড়িয়ে সস্নেহে নিজের শূন্যঘরে তুলে নিয়েছেন তা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারি।

তারপর বিশুহারা কৈলাস খুড়ার বিরহকরুণ দিনগুলি নিপুণ রসশিল্পী কী বেদনার রঙেই না পরিসমাপ্ত ক'রেছেন! কৈলাস খুড়ার একান্তকরুণ মৃত্যুদৃশ্য, রাজসম্পদ ও সংসারত্যাগী মহারাজা ভরতের সেই মাতৃহীন হরিণ শিশুর বাৎসল্যমায়া এবং তারই বিচ্ছেদে সেই আর্ত্তকাতর প্রানত্যাগের মর্ম্মন্তুদকাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্ব্বহারা সর্ব্বত্যাগী প্রবীন পুরুষমানুষ সংসার ও পরিবারের গণ্ডীর বাইরে এসেও একদিন যে-কোনও নিঃসম্পর্কীয়জনের সাথে সুগভীর বাৎসল্যমায়ায় কতখানিই যে বন্দী হ'তে পারে—এক দেখেছিলাম পুরাণের সেই ভরতরাজাকে আর দেখছি এই কৈলাস খুড়াকে।

শরৎসাহিত্যে বাৎসল্যরসের ধারাবাহিক সুসম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হ'য়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেওয়া বিধেয় নয়। সুতরাং মাত্র গুটিকয়েক চিত্র নিয়ে আজ সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রেই ক্ষান্ত হলাম।

এ হেন অন্তঃস্পর্শী উচ্চ রসাশ্রিত বহু বিচিত্র সৃষ্টির শক্তি আছে যাঁর সেই অসামান্য শিল্পীর পরমা প্রতিভার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শরৎ-বন্দনা

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

হৃদয়ের ছন্দ আর
বন্দনায়
গাহিবে তোমার
কোন্ গান ?
মরমের অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা-অনুরাগে
বহুদিন আগে
দিয়াছি ত শ্রীচরণে তব
ভকতের অভিনব
পূজা-অবদান।

*　　*　　*

মায়ের ভাষার দ্বারে
বারে বারে
এলো অহঙ্কারে
লক্ষ জন,
তাহাদের সকলের ছিল সাধ মনে
ভরিবে যতনে
মালিন্যের মসীতে আঁধার
কথার ভাণ্ডারে তার
নবীন রতন

*　　*　　*

তারা গিয়েছিল ভুলি
শূন্য ঝুলি
দ্রুতবেগে তুলি—
মরীচিকা

ছুটেছিল অনুসরি তারা মোহভরে ;
তাহাদের করে
প্রতিভার যাদুমন্ত্রপূত
কল্পনার করচ্যুত
ছিল না তুলিকা।

* * *

ভারতীর স্নেহাশিস্ লভি
অগরবী—
ওগো কথা-কবি !
জ্যোতিঃ-ঝরা

সে কুহক-তুলিকাটি তুমি পেলে হাতে,
তারি রেখাপাতে
কি বিচিত্র নর নারী-সৃজন-লীলায়
আনিয়াছ বসুধায়
চির চিত্ত-হরা !

* * *

শরৎ-বন্দনা

যে লেখনী সুধা-পরিবেষে
সারাদেশে
আজি ভালবেসে—
সুবিমল

অর্চ্চনার অর্ঘ্য আনে মানবী-মানব
কণ্ঠে মধুস্তব ;
গাহি তার মৃত্যুহীন জয়
তারি গর্ব্বে যেন রয়
হিয়া সমুজ্জ্বল ।

*   *   *

অনুপম হে লিপি-কুশলি
শুধু বলি'
গেছ তুমি দলি—
সত্যকাম !

সনাতন সমাজেরে যোগ্য কশাঘাতে,
মহা মহিমাতে
গড়িয়াছ মূর্ত্তি নারীত্বের ;
আর শুধু অন্তরের
জানাই প্রণাম ।

শরৎচন্দ্র

শ্রীঅবনী নাথ রায়

শরৎচন্দ্র যে আমাদের দেশের সব চেয়ে জনপ্রিয় লেখক এতে কারোর মনে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের অগণিত পাঠক পাঠিকা তাঁর লেখাকে ভালবেসেচে। তারা সমালোচকের গুণাগুণ বিচারের অপেক্ষা রাখে নি। এখন সমালোচকের কর্ত্তব্য হ'চ্চে কেন শরৎচন্দ্রের লেখা জনসাধারণের এত প্রিয় তার কারণ নির্দ্ধারণ করা। পদ্ধতিটি inductive.

এই রকমই হয়। মানুষের মনে বিনা উত্তেজনায় ভালো লাগার যে কষ্টিপাথর আছে তার উপর রেখাপাত ক'রতে না পারলে সহস্র সমালোচকের সাধ্যও নেই যে কোন বস্তু তাকে ভালো লাগায়।

ভালো লাগার নানান্ গুণ শরৎচন্দ্রের সমগ্র লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আমি তার দু' একটার উল্লেখ ক'রব মাত্র। প্রথম কথা, শরৎচন্দ্র তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে মানুষের মানবত্বকে এক গৌরবময় উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেচেন। মানুষের উপর তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। Honesty is the best policy এই নীতিবাক্য আমরা বাল্যকাল থেকে শুনে আস্চি। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে মানুষ যে কি ক'রে এই নীতি অকুণ্ঠিত চিত্তে চিরকাল জীবনে পালন ক'রে যেতে পারে তার উদাহরণ আমাদের জানা ছিল না। তিনি তাঁর 'বৈকুণ্ঠের উইল' গল্পের ভিতর দিয়ে এই নীতিবাক্যের সার্থকতা সপ্রমাণ করলেন, এবং এর জয়ঘোষণা করলেন। পঠদ্দশায় অপরিণত বয়সে গোকুল একদিন স্কুলের হেডমাষ্টার মশায়ের নিষেধ উপেক্ষা কর্‌তে না পেরে সুযোগ সত্বেও পরীক্ষার হলে বই দেখে লেখে নি। এ ঘটনা আমাদের অজ্ঞাত ত নয়ই, বরঞ্চ অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু এই অতিরিক্ত

পরিচিতির ফলেই আমাদের কাছে এ ঘটনার কোন মূল্য ছিল না। শরৎচন্দ্র গোকুলের বালক বয়সে দুর্নিবার লোভকে অতিক্রম করার সহজ শক্তি দেখে তার ভবিষ্য-জীবনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেলেন। গোকুলের বাবা বৈকুণ্ঠ ব্যবসায়ী লোক ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ের একটি মাত্র মূল সূত্র শিখেছিলেন,—কাউকে ফাঁকি দেবেন না। স্কুলের ঐ ছোট্ট ঘটনায় পুত্রের নির্লোভিতার প্রমাণ পেয়ে বৈকুণ্ঠ এই মনে ক'রে আশ্বস্ত হ'লেন যে গোকুলের উপর নির্ভর করা যায়। ব্যবসায়ে তার উন্নতি অনিবার্য্য, কারণ সমস্ত ব্যবসায়ের গোড়াকার নীতি তার শেখা হ'য়ে গেছে। আরো একটা কথা। এর থেকে গোকুলের চরিত্রেরও একটা হদিশ পাওয়া গেল। গুরুজনের হুকুম অবশ্য প্রতিপাল্য ব'লে মেনে নেওয়ার শক্তি গোকুলের ছিল। হেডমাষ্টার মশায় যেমন হাজার রকমের হুকুম দেন, 'পরীক্ষার হলে বই দেখে লিখো না' তাঁর এ হুকুমও সেই সাধারণ হুকুমের অন্তর্গত। কিন্তু গোকুলের চোখের সাম্‌নে এই নিষেধাজ্ঞা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌তে লাগলো, সুবিধা, সুযোগ এবং লাভের সাধ্যও হ'ল না যে তাকে এক মুহূর্ত্ত গোকুলের চোখের সাম্‌নে থেকে সরিয়ে দেয়। চরিত্রের এই বিশেষত্বটি ছিল ব'লেই স্বর্গগত বাপের কোন হুকুম সে জীবনে অগ্রাহ্য ক'র্‌তে পারলে না। সমস্ত শ্বশুরকুলের সমবেত চেষ্টার ফলেও গোকুলের দোকানের একজন কর্ম্মচারী বরখাস্ত হ'ল না যাকে তার মা বাহাল রাখতে চাইলেন।

এই যে হুকুমের উপর বরাত দিয়ে হুম্‌ড়ে পড়ে থাকা, আর শত সহস্র যুক্তি কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ না করা, একে একদিক দিয়ে

মনের একটা অযৌক্তিক প্রকৃতির গঠন বলা যেতে পারে। কিন্তু সেইটুকুই এর একমাত্র কথা নয়। এর মধ্যে কর্ত্তব্যপরায়ণতার যে প্রশান্তি এবং স্থৈর্য্য আছে তাই মানুষকে সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'তে শক্তি দেয়। আর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু দেখা গেছে যে মানুষ কেবলমাত্র যুক্তিবাদের সম্বল নিয়ে বাঁচতে পারে না; তাকে অনেক সময় অপৌরুষেয় কোন সত্বার উপর নির্ভর করতেই হয়। এখন এই অপৌরুষেয় সত্বার নাম ঈশ্বরই দিই, আর গুরুবাক্যই বলি।

আর আমার ধারণা 'বৈকুণ্ঠের উইল'এর গল্পে গোকুলের ছোট ভাই বিনোদ যে অধঃপথ থেকে ফিরে এসে দাদার পায়ের তলায় একদিন শুয়ে পড়েছিল তার একমাত্র কারণ গোকুলের ন্যায়নিষ্ঠা, আর অচলা পিতৃমাতৃ-ভক্তি। শত শত যুক্তিতর্কের জালের সাধ্য ও ছিল না বিনোদের যুক্তিতর্কবহুল মনকে অবরুদ্ধ ক'রে হার মানায়। মনের স্বেচ্ছায় হার মানার সুযোগের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকা ব্যতীত উপায় নেই।

অত্যন্ত আলোচিত একটি প্রবাদ বাক্য থেকে শরৎচন্দ্র যে মনুষ্য-চরিত্রটি গড়ে তুলেচেন তা' সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। এর দ্বারা তিনি মনুষ্যত্বকে তার pristine glory বা আদিম মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা অনেকদিন থেকে পরার্থে দধীচি মুনির অস্থি প্রদানের গল্প এবং দাতা কর্ণের অতিথি সৎকারের জন্য নিজের পুত্রকে বলি দেওয়ার গল্প শুনে আস্‌চি। এগুলি এখন আমাদের কাছে সত্যিই গল্প হ'য়ে গেছে। এদের সত্য ব'লে আর আমরা মনে করি নে এবং আমাদের জীবনের উপর এদের কোন প্রভাব নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র যে গোকুল মজুমদারের গল্প লিখলেন সে যে বিংশ শতাব্দীরই

বাসিন্দা তা' আমরা জানি। সুতরং তার উদাহরণ যে বিংশ শতাব্দীর লোককে প্রভাবান্বিত করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় কথা, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে অসামাজিক প্রেমকে পাংক্তেয় ক'রে তাকে একটা স্থান দিয়েছেন। অসামাজিক নাম দিলুম সেই ধরণের প্রেমকে যা' আমাদের সমাজ-পদ্ধতির দ্বারা স্বীকৃত নয়। এর জন্যে শরৎচন্দ্রকে যে কত কটূক্তি সহ্য করতে হয়েচে তার আর সীমা পরিসীমা নেই। "পল্লী-সমাজ" লিখে তিনি অনেক গাল খেয়েচেন এ কথা তাঁর কোন একটা অভিভাষণে পড়েছিলুম। কারণটা বোধ হয় এই যে বাল-বিধবা রমা আবার রমেশকে ভালবাসতে গেল কেন? সে যে বিধবা, স্বামী ছাড়া আর কাউকে যে ভালবাস্তে নেই, এ কথা কি সে জানে না? কিন্তু যাঁরা এই বই পড়ে ক্ষুব্ধ হন, আমার বিশ্বাস তাঁরা অত্যন্ত অবিচার করেন। ও-বইয়ের কখনই এ কথা প্রচার করা উদ্দেশ্য নয় যে জগতে যত বাল-বিধবা আছে তারা কাউকে না কাউকে ভাল বাসুক। কথাটাও নিতান্ত ছেলেমানুষী এবং কাজটাও জোর ক'রে হবার নয়। বরঞ্চ বইখানার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে শক্ দেওয়া। মানুষ যখন নিজে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র সামাজিক নিয়মের বশীভূত হ'য়ে দিন কাটায় তখন সেই জড় মনকে শক্ না দিলে তার চেতনা হয় না। সামাজিক রীতিনীতির বাঁধনে আমরা হাত পা বেঁধে ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে বসে আছি! কত তুচ্ছ কারণে যে কত বড় সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাচ্চে সেইটুকু দেখান "পল্লী-সমাজের" অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষকেরা উদ্বিগ্ন হলেন এই ভেবে যে বুঝি ঐ রন্ধ্রপথে শরৎচন্দ্র দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে চান। জগতে এ ভুল মানুষ

বার বার করেচে, বিশ্ব-সাহিত্যে তার উদাহরণের অভাব নেই। গত শতাব্দীতে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক Emile Zolaর ভাগ্যেও এই দুর্দ্দশা ঘটেছিল। তাঁর L'Assommoir নামক উপন্যাস, যার জন্যে আজ তাঁর এত নাম, সেই বই লোকে ফরাসী শ্রমজীবীদের উপর আক্রমণ মনে ক'রে বর্জ্জন করেছিল। কিন্তু সে ভুল ভেঙেচে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। Zola তাঁর সম্মানের আসন পেয়েচেন। তাঁর উপন্যাস আদৃত হয়েচে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন শৈবলিনীকে দিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিলেন, রমা যদি সে রকম কোন অনুষ্ঠান করতো তবে হয়ত গোল মিটে যেত। তাতে সামাজিক নিয়মের মর্য্যাদা হয় ত অক্ষুন্ন থাকতো কিন্তু সে সত্য হ'ত না, অতএব সাহিত্যও হ'ত না। মানুষের জীবন ত যন্ত্র নয়, তার হৃদয় জ্যামিতির পাতা নয় যে তার উপর নিয়মমত সম্পাদ্য উপপাদ্য কসে গেলেই হ'ল। তার ইচ্ছা আছে, অনিচ্ছা আছে, ভালবাসবার শক্তি আছে, ঘৃণা করবার অধিকার আছে। এই সব নিয়েই ত মানুষ। তার জীবন-লীলা ত ঘড়ির অহোরাত্র প্রদক্ষিণের ধর্ম্ম নয়। সাহিত্য-বিচারে এ সব কথা ভুললে চলবে কেন?

স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র পাল শরৎচন্দ্রকে যুগ-প্রকাশক ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। যে যুগে আমরা বাস করচি তার সমস্যা গত যুগ থেকে বিভিন্ন, তার সমাধানের ভার এই যুগের মানুষের হাতে। গতানুগতিকতা জীবিতের লক্ষণ নয়। বিংশ শতাব্দীর নবযুগের যে নবতন সমস্যা তার সমাধান করতে হ'লে চাই সহৃদয়তা, সংস্কারমুক্ততা, হৃদয়ের প্রসারতা, দৃষ্টির বিশালতা—শরৎচন্দ্র তারই অগ্রদূত।

শরৎ-বন্দনা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মেঘমুক্ত সাহিত্য-আকাশে
স্তিমিত বঙ্কিম চন্দ্র
হাসে রবি নব প্রভাতের
বিকীর্ণিয়া স্বর্ণ-রশ্মি দিগন্ত প্রসারী !
গগনে-গগনে গ্রহ তারা জ্যোতিষ্ক প্রধান
ছিল যারা জাগিয়া সেদিন
সে আলোর প্লাবনে ডুবিয়া
হারালো আপন দ্যুতি ।
দীপ্ত সেই আদিত্যের সহস্র-কিরণে
সমগ্র সাহিত্য ক্ষেত্র শ্যাম সমুজ্জল !

*   *   *   *

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সাথে
নিদাঘ-প্রহর হল সারা ।
বরষা নামিল আসি
ভানুর তনুর দীপ
ঘিরিল সে অঞ্চল আড়ালে ;
ম্লান হোল জলদর্চ্চি শিখা ।
ইন্দ্রায়ুধ উঠিল গরজি ;
ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎ চঞ্চল !
জলযন্ত্রী জলদের বুকে
জাগিয়া উঠিল রামধনু
সপ্তবর্ণে বিচিত্র সুন্দর !

শরৎ-বন্দনা

বাদল বিদায় নিল,
থামিল মাদল।
শ্রাবণের হেনার মঞ্জরি
ভরি দেয় নিকুঞ্জের পথ ;
শরতের শঙ্খনাদ
শোনা যায় দূর হ'তে যেন
অভিসারিকার পায়ে
বেঁধেনা কেতকী কাঁটা আর
কদম্ব কেশর গেল ঝরে।

সুনির্ম্মল নীল নভতলে
উদিল সহসা
শরতের পূর্ণচন্দ্র
দিগন্ত উদ্ভাসি।
জ্যোছনার মত্ত পারাবার
পূর্ণিমার তরঙ্গে উদ্বেল !
আকাশের চক্রবালে যেন
কোটি আলোকের উৎস
উচ্ছ্বসিত আজ।

৫

শরৎ-বন্দনা

ধরণী দুলিল কৌতুহলে।
বিস্ময়ে তুলিয়া মুখ
আঁখি মেলি হেরিল জনতা
জ্যোতির্ম্ময় লোকে আজ
দেখা দিল এ কোন দেবতা!
এ যে অপরূপ অতি
অপূর্ব্ব সুন্দর!
নবতর প্রতিভায় প্রদীপ্ত উজ্জ্বল
অরুণ রথের পাশে হাসে দাঁড়াইয়া।
সভক্তি সম্ভ্রমে সবে নোয়াইল শির,
নূতন দেবতা জানি করিল বন্দনা,
পুলকে ধ্বনিল তার জয়
জুড়ি পাণি দিল নমস্কার
তাহার উদ্দেশে বার বার।

শরৎচন্দ্র

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

'আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, কিন্তু তারো চেয়ে আশ্চর্য্য মানুষের মন' জীবানন্দর মুখে শরৎচন্দ্রের এই স্বীকারোক্তিটুকু শুনে একটি বিচিত্র আনন্দ অনুভব করি। তাঁর সমস্ত সাহিত্যের ভিতর হইতে মানব-মনের এই বিস্ময়কর রূপ নব নব ভাবে আপনাকে প্রকাশ ক'রেছে।

সকালের দিকে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, গাছের পত্র-পল্লবে এখনও জলের ফোঁটাগুলি আলোয় ঝল্‌মল্‌ ক'রচে, সাদা মেঘখণ্ডগুলির ফাঁকে ফাঁকে কোমল নীল আকাশ, তারই নীচে দিগন্ত প্লাবিত উজ্জ্বল রৌদ্র-কিরণ, —এম্‌নি সময় জান্‌লার ধারে শুয়ে শরৎচন্দ্রের বইগুলি পড়তে ভালো লাগে। তাঁর 'চরিত্রগুলি' গল্পের কল্পলোক থেকে নেমে সুমুখে এসে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, আপন আপন মনের কথাগুলি অসাধারণ সারল্যে ও সুন্দর ভঙ্গীতে ব'লে যায়,—শরৎচন্দ্র কোথাও তাদের আত্মবঞ্চনা ক'রতে শেখাননি, শেখাননি ব'লেই আমাদের প্রতিদিনের দেখা, প্রত্যহের জানা মানুষ তাঁর কলমের মুখে অপরূপ হ'য়ে ওঠে।

মনে হয় জীবনের ক্ষেত্রে এই মানুষটির ছিল বিপুল অভিজ্ঞতা, বিশাল কল্পনা। এই অভিজ্ঞতার তলায় তাঁর 'আশ্চর্য্য মন' অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে কাজ ক'রে গেছে, কোথাও তার বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই! যা কিছু তিনি এ জীবনে পেয়েচেন, তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি

তাকেই বুদ্ধির ছাঁচে ঢেলে বিশ্লেষণ ক'রেছে, সাহিত্য-বিচার বোধের দ্বারা তাকে গ্রহণ অথবা বর্জ্জন ক'রেছে। এই মানুষটির দিকে তাকালেই আমি একটি বিস্ময় ও উল্লাস অনুভব করি, সে যে কী আনন্দ আমি ব'লতে পারিনে,—ব'লতে পারতাম যদি তাঁর শ্রীকান্তর মত কোমল ও মধুর আত্মপ্রকাশের ভাষা আমার হাতে থাকতো। শিশির-স্নাত প্রভাতের জলপদ্ম যেমন একটি একটি ক'রে আপন পল্লব-দল সূর্য্যের দিকে প্রসারিত ক'রে জেগে ওঠে, এক একখানি উপন্যাস লিখে শরৎচন্দ্র আপন মনের মাধুর্য্য চারিদিকে বিকীর্ণ ক'রেচেন। তাঁর লেখা পড়তে গেলেই একটি চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিস্তব্ধ রাত্রির রূপ মনে ভাসতে থাকে, একটি তপস্বীর রূপ, অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষু একটি ধ্যানমূর্ত্তি!

অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত সাদাসিধে, মাথার চুলগুলি আগোছালো, কাঁচা-পাকা,—চোখে তাঁর ঔজ্জ্বল্যও নেই, প্রশান্তিও যে আছে এমন বলা চলে না,—অথচ ওই চোখে তিনি কি না দেখেচেন! মানুষের পাপ, লজ্জা, কলঙ্ক-কালিমা কিছুই এড়ায়নি; নির্ম্মল প্রেম, মহিমান্বিত আত্মত্যাগ, মাধুর্য্যময় হৃদয়-দাক্ষিণ্য,—ওই চোখের দৃষ্টি সবাইকে অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধ করে' গ্রহণ ক'রেছে, বরণ ক'রেছে।

সাহিত্যে তাঁর মতবাদ কোথাও দেখিনি। ভাবজগতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তাঁর নেই, তিনি একজন মানব চরিত্রদ্রষ্টা। মানব-চরিত্র নিয়েই তাঁর সাধনা, তাঁর আনন্দ। সমাজ ও সংসারের শত বিরোধীতার ভিতর দিয়ে তাঁর নরনারী সংগ্রাম করে' চলেচে। সে সংগ্রাম তাদের বাইরে নয়, অন্তরে অন্তরে। তাই তাঁর গল্পগুলিতে দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু

উত্তেজনা নেই, বেদনা আছে কিন্তু বিক্ষোভ নেই, অশ্রু আছে কিন্তু জ্বালা নেই।

তিনি যখন কথা বলেন তখন তার খানিকটা বোঝা যায়, খানিকটা বোঝা যায় না। আমার মনে হয় কথা বলবার সময় তিনি অন্য কথা ভাবেন, অন্য দিকে তাঁর দৃষ্টি। তাঁর কথার মধ্যে কোথাও ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি, জ্ঞানের গভীরতা অথবা চিন্তার সুসঙ্গতি থাকে না— যেমন থাকে তাঁর গল্পের মধ্যে, তাঁর নরনারীর চরিত্রের মধ্যে। তাই ভাবি ওই মানুষটি অত্যন্ত জটিল ওই মানুষটির চেহারার নির্বোধ সারল্যের নীচে আছে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কুটিল ও চতুর, আত্মসচেতন অথচ মহৎপ্রাণ মানুষ—যার আবেগ এবং আন্তরিকতায় সমগ্র বাঙালী-জাতি মুগ্ধ।

মুখের কাছে হাত নেড়ে, মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেককে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লতে দেখেছি, তিনি থাকেন নির্ব্বিকার। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলাপে তাঁর অতিরিক্ত বৈরাগ্য, যেন শুনতেই পাচ্ছেন না! বক্তা যখন উত্তেজিত বক্তব্য শেষ ক'রে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন, তখন তিনি হয়ত ব'লে উঠলেন, 'তাই নাকি ? হ্যাঁ··· বুঝলে হে, তামাকটা মাঝে মাঝে না খেলে আমার কিছুতেই চলে না, ওটা আমার চাইই।'

মেয়েরা শরৎচন্দ্রকে খুব ভালবাসেন। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে মহলে তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠা, তার কারণ, প্রেমের গল্প তিনি অতি সুন্দর

ক'রে, রহস্যময় ও জটিল করে', মনোরম ক'রে ব'লে যান্। নারীর মনে যেখানে প্রথম প্রেম সঞ্চারিত হ'তে সুরু ক'রেছে, সেখান থেকেই শরৎচন্দ্রের গল্প সুরু হ'লো, এবং শেষ হলো মিলনে কিম্বা বিচ্ছেদে। এর মাঝখানে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির যে অপূর্ব্ব কলাকুশলতা, যে-সংযম, যে-মাত্রাবোধ. এবং যে-অপরাজেয় কথোপকথনের ভঙ্গী—তাদের প্রতি মেয়েরা সর্ব্বান্তঃকরণে আকৃষ্ট হন্। সভায়, সমিতিতে মেয়েরা নির্ব্বাক কৌতূহলময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন, তা'দের চোখে বিস্ময়, —শরৎচন্দ্রের মধ্যে তাঁরা যেন মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েচেন। তাঁদের সে চাহনি দেখলে মনে হবে এই অনন্যসাধারণ শিল্পীর হাতে তাঁদের চরিত্র ও মন যেন ধরা পড়ে গেছে, তাঁদের আর পালাবার পথ নেই।

সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব যেমন বিরাট, আমার মনে হয় সমাজ-জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্ব তেমনি অতি সামান্য। তাঁর নায়ক-নায়িকার চরিত্র যেমন বলিষ্ঠ এবং দৃঢ়, তিনি সে রকম নন্। সম্ভবতঃ তাঁর ভিতরে নরম মাটির একটা ছাঁচ আছে, জীবনে নানা অবস্থায় সে ছাঁচ নানা রকমে বদ্‌লেছে। হাঁ, অনেকটা এই রকমই বটে। যাদের সৃষ্টি ক'রতে হবে, জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র যাদের ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে, তাদের চরিত্র বহু বিচিত্র অবস্থাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে। যারা আর্টিষ্ট্ তাদের কোনো প্রিন্‌সিপ্‌ল্ নেই, নিজের আদর্শ ছাড়া জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ কন্‌ভিক্‌সন্ মান্‌লে তাদের চল্‌বে না।

রূপ-রেখার মধ্যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই শিল্পীর কাজ। শরৎচন্দ্রের

রচনায় সতীত্বও যেমন সুন্দর, অসতীত্বও তেমনি মনোহর, পাপের চিত্রও যেমন অপরূপ, মহত্বও তেমনি মনোমুগ্ধকর। কেমন ক'রে কোন্ কথাটি বললে মধুর হবে, আনন্দদায়ক হবে—অতি যত্নে তিনি এক-একটি শব্দ নির্ব্বাচন করেন। শব্দ-নির্ব্বাচনে তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা।

অত্যন্ত রহস্যময় তাঁর জীবন, তাঁর সম্বন্ধে বহু জাতীয় জনশ্রুতি। কেউ তাঁকে বুঝলো না, যারা বুঝলো তারা ভুল করল। তাঁর আলাপে কোথাও স্নেহের স্পর্শ নেই, শ্রদ্ধার ইঙ্গিত নেই, ভালবাসার ইসারা নেই, বন্ধুত্বের কোমলতা নেই। 'পথের দাবীর' সব্যসাচীর মত তিনি লম্বা, রুক্ষ, শিরাবহুল হাত-পা, শিকড়ের মত পাকানো দেহ, লম্বা নাক, লম্বা মুখ,—সর্ব্বাঙ্গে তাঁর একটা কর্কশ কাঠিন্য।

তাঁর কোনো একখানি উপন্যাসের কোনো একটি ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে একদিন একব্যক্তি ব'ললেন, 'আচ্ছা, ওটা ওরকম হ'লো কেন, বলুন ত ?'

'কোন্‌টা ?' ব'লে তিনি মুখ তুলে তাকালেন, 'ওসব কি আর মনে আছে হে, কত মিথ্যে কথা লিখেছি বিনিয়ে বিনিয়ে—'

একদিন ব'ললেন, 'এই কথাটাই আমি ভাবি, বুঝলে, যাঁরা শ্রদ্ধেয় হ'য়েছেন, বড় হতে পেরেছেন তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ ক'রলে অনুতাপের আর অন্ত থাকে না।'

সেবার কাগজে-কাগজে কি-একটা সাহিত্য-আন্দোলন চলছিল,

নিন্দা ও কটূক্তির আর বিরাম ছিল না, বুঝলাম তাঁর ইঙ্গিতটা সেই দিকেই। ব'ললাম, 'কিন্তু যাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁরাই যদি অশ্রদ্ধেয় কাজ করেন?'

'তা হোক, তা হোক'—তিনি ব'ললেন, 'সে বিবেচনা তাঁদের, তোমার ত নয়। তোমার শক্তি আছে, তুমি বড় হবে, একদিন যেন নিশ্চয় জান্‌তে পারি তুমি অন্তত এই নোংরামির মধ্যে নেই, আমি জানি তোমাকে।'

তারপর একটু থেমে ব'ললেন, 'আমার সাহিত্য-জীবনে আমি কোনোদিন কারুকে আঘাত করিনি, অসম্মান করিনি। বুঝলে, ও আমি পারিনে।'

তিনি কী? সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী, না গৃহগতপ্রাণ? তাঁর সব ছন্নছাড়া, মানস-পুত্রগণ—শ্রীকান্ত, সতীশ, সুরেশ, শিবনাথ, দেবদাস, জীবানন্দ—এরা কি তাদের স্রষ্টার চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে? জীবনে তিনি কী চেয়েছিলেন, কী-ই বা পান্‌নি? তাঁর হৃদয় কি 'পথ হারানো সুরে, সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে?' তাঁর সাহিত্যের প্রশ্ন অতৃপ্তির, না বেদনার?

তাঁর লেখাগুলি পড়্‌তে পড়তে এই কথাগুলিই আমার মনে হয়।

শরৎচন্দ্র

হুমায়ুন কবির

দরদী তোমারে কেমন করিয়া জানাব আজ
তোমার দরদে মোরাও দরদী সবে ?
লক্ষ বুকের দুঃখ সুখের রচিয়া সাজি
আনিয়াছ তুমি অশ্রুতে উৎসবে।
কোথা পল্লীর জড়তার গুরু বিষম ভার
প্রাণের সহজ প্রকাশ রুধিছে বারম্বার,
অসহায় হিয়া সহিয়া চলেছে অত্যাচার
কেবল বিলাপ জানায়ে আর্ত্তরবে।
কবি, তুমি মূক নিগূঢ় গোপন সে বেদনার
দীপ্ত কাহিনী ধ্বনিয়া তুলিলে ভবে।

হেথায় মোদের সমাজ-শাসন কঠিন ঘোর,
বাধার ওপর বাঁধন রচিনু কত,
সে কারা গাঁথিতে কত চোখে বহে অশ্রুলোর,
ভিত্তিতে কত হৃদয় রক্তস্রোত।
কত অপমান, বেদনা, হতাশা, অশ্রুনীরে
নির্ম্মম জড় কঠিন প্রাচীর রেখেছে ঘিরে,
তাহার রুদ্ধ পাষাণ কক্ষে কাঁদিয়া ফিরে
ভগ্ন মনের হাহাকার অবিরত।

শরৎ-বন্দনা

পৌঁছেনি ভীরু যে কথা মোদের হৃদয়তীরে
সে ব্যথারে তুমি দিলে রূপ শাশ্বত।
মোদের জীবনে আনন্দ কোথা, কোথায় হাসি ?
চিন্তাবিহীন উচ্চ হরষ রোল ?
একটানা ঢিমা জীবনের ছায়া প'ড়েছে আসি—
শিশুও ভুলেছে আনন্দ কল্লোল।
কোথা বিচিত্র জীবনের নব প্রকাশ নিতি ?
হৃদয় দোলানো আশা আশঙ্কা হর্ষভীতি ?
গোপান চিত্ত উদ্বেল করি' তীব্র গীতি
জীবন-প্রকাশ করিতেছে চঞ্চল ?
প্রতিদিন মাঝে আমরা হেরিনু প্রাচীন রীতি
তুমি হেরিয়াছ সেথায় প্রাণের দোল।

অতীত স্বপন নিয়ে যারা চাহে থাকিতে ভুলি'
বর্ত্তমানের কঠিন সত্যরাশি,
নিষ্ঠুর করে তুমি তাহাদের নয়ন খুলি'
আজিকার রূপ তাদের দেখালে আসি।
দেশের শ্মশানে ফিরি আজি মোরা প্রেতের দল।
ক্ষীণ কঙ্কাল টানিবার মত নাহিক বল,
প্রাণহীন দেহ, শুকাইয়া গেছে অশ্রুজল,
নির্জ্জীব শব কালস্রোতে চলি ভাসি'।

তোমার বজ্রবাণীতে আলোড়ে মর্ম্মতল
যুগান্তরের পুঞ্জ জড়তা নাশি'।

দেশের মনের বেদনারে তুমি দিয়াছ ভাষা,
তোমার কণ্ঠে মোরা তাই খুঁজি বাণী।
ব্যক্তিজীবনে চিরদিনকার লুকানো আশা
তারেও খুঁজিয়া ভাষা তুমি দিলে আনি'।

বালক মনের অতি ছোট সুখ বেদনা ক্ষীণ,
প্রতি দিবসের জীবনের যত রজনী দিন,
হতভাগিনীর কঠিন হতাশা অশ্রুহীন,—
সকলি আপন বক্ষে লইলে টানি'।

সাধনারে তুমি স্বপ্নের মোহে করনি লীন
দুঃখ সহিলে সত্যের সন্ধানী।

কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাঙলার কথাসাহিত্যের রাজ্যে নামটির প্রথম আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি বিচিত্র। লোকের সেদিন কৌতূহলের অন্ত ছিল না—সপ্রশংস এবং অপ্রশংস দু' রকমেরি কৌতূহল। সমজ্‌দারেরা দেখলেন একটি পরিণত প্রতিভার রূপ আর সমাজদারেরা,—বলা বাহুল্য, সভয়ে—একটি নতুন কালাপাহাড়। ফলে এই হ'লো যে সু এবং কু দু' প্রকারের যশে নামটি অতি অল্পদিনেই দেশে ছড়িয়ে প'ড়ল। ব্যক্তিটি কিন্তু র'য়ে গেলেন রহস্য লোকে, একেবারে অপরিচিত। আজো সেই অপরিচয়। নাম আর নামীকে মিলিয়ে অনেকবার দেখা গিয়েছে; কিন্তু তাঁর নাড়ী নক্ষত্রের খবর আজো প্রায় অজ্ঞাত।

তবু ক্ষোভ করি না, কারণ, তাঁর সৃষ্টিকে চোখের সাম্‌নে পেয়েছি, বেশ আপনার ক'রেই পে'য়েছি। এরি ভিতর দিয়ে স্রষ্টারো কতকটা পরিচয় মিলেছে। পরিচয় সর্ব্বাঙ্গীন নয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ।

কথা-সাহিত্যের উপাদান মানুষ। মানুষের আবার দুটো রূপ—বাইরের আর ভিতরের অর্থাৎ সামাজিক আর অতি-সামাজিক। সামাজিক রূপটিতে সংস্কারের মোহ আছে, অথচ আপাতদৃষ্টিতে সে সুরম এবং সত্য; অতি-সামাজিকটি সনাতন, কিন্তু সূক্ষ্ম—অব্যক্ত। এই কারণেই কথা-সাহিত্যেরো স্রোত বয় সাধারণতঃ দু'ধারায়—একটিতে

চলে সামাজিক রূপের গড্ডালিকা, আর অপরটিতে সামাজিকের ওপর অতি-সামাজিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সাধনা। শেষেরটিতে জাগে সমস্যা। বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্য্যমুখী ব্রজেশ্বরেরা যা' মেনে নেয়, রবীন্দ্রনাথের বিমলা সন্দীপরা তা' মানে না, শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী কমলরাও না।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য প'ড়েছিলেন; তা'র দ্বারা প্রভাবিতও হ'য়েছিলেন। তবু বাঙলার সমাজের রীতি নীতির ওপর সংশয় কর্‌বার মতন সামর্থ্য তিনি লাভ ক'র্‌তে পারেন নি—এত কাল ধ'রে যা' চ'লে আস্‌ছে তা'কে নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়াই ছিল তাঁর ধর্ম্ম। আগে মানুষ, পরে সমাজ এ বিতর্ক তাঁর মনে ওঠেই নি। অবশ্য সেখনকার দিনে এই রকম হওয়টাই ছিল স্বাভাবিক। সমাজসম্পর্কে যা' অন্যায় ব'লে তিনি মনে ক'র্‌তেন, তাকে ক্ষমা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কুন্দ রোহিণী গোবিন্দলালের দলকে ভুগতেই হবে, মরতেই হবে। মানুষকে তিনি চিন্‌তেন, তা'দের অবিকল ছবিও আঁকতে পার্‌তেন। কিন্তু মানুষের সমগ্রটুকুর ছবি সে নয়, সমাজের মানদণ্ডে তা'র যেটুকু ওজন পাওয়া যেতে পারে মাত্র সেই টুকুর; Shakespeare-এর মতন—The people are always a mob, the rabble। তবু Shakespeare শ্রেষ্ঠশিল্পী, বিশ্বশিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রও বিশ্বশিল্পী না হ'লেও শ্রেষ্ঠশিল্পী। বাঙলার কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে তাঁর নাম লেখা থাক্‌বে। এদেশের কথা-সাহিত্যিক মাত্রকেই ব'ল্‌তে হবে—We are all descended from Gogol's cloak', যদিও Gogol ছিলেন Objective Artist. Maupassantর মতন। কথা-সাহিত্যের কতকটা প্রবর্ত্তকরূপে এবং

বিশেষতঃ শিল্পীরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদিত। তবু বঙ্কিমচন্দ্র যে অচলায়তনের অধিবাসী এবং একজটেশ্বরী Nemesis তাঁর উপাস্য দেবতা একথা মনে হবেই হবে।

সমাজের এই তথাকথিত নীতিবাদের ওপর সংশয় তথা প্রতিবাদের আঘাত দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সন্দেহ প্রতিবাদ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করল বিমলা সন্দীপের চরিত্রে। বাঙ্‌লার সমাজ সেদিন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল, ভয়ও পেয়েছিল; কিন্তু ব্যাপকভাবে গুরুতর বিপদের আশু সম্ভাবনা ছিল না। ছিল না এইজন্য যে, নামগুলি বাঙ্‌লার হ'লেও চরিত্রগুলি সাগরপারের Nora Rudinএর স্বজাতি। এদেশের আবহাওয়ায় naturalised হ'তে ওদের সময় লাগ্‌বে, হয়তো এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এ আব্‌হাওয়া ওদের ধাতুতে ঠিক্ সইবে না। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ কবি—idealist. 'ঘরে-বাইরে-র মতন উপন্যাস যে-কোনো দেশের গৌরব; এদেশে আজো তা'র প্রভাব চ'ল্‌ছে। শিল্পীর নৈপুণ্য ওতে চরমসীমায় উঠেছে। তবু artistic—Turgenev-এর মতন।

সত্যকার ভয়ের কারণ হ'লেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র কালাপাহাড়; বটেই তো। তিনি নিজেই বা কোন্ অস্বীকার করেন, বা ক'র্‌তে পারেন? কালাপাহাড় মূর্ত্তির ভিতর দেবতাকে পান নি ব'লেই তো মূর্ত্তি গুঁড়ো ক'রেছিলেন। সমাজ না ভাঙ্‌লে-যে মানুষকে পাওয়া যায় না। জড় বল্মীকের স্তূপ, তা'র নীচে ধুক্‌ধুক্ ক'র্‌ছে বাল্মীকি—স্তূপ না ভাঙ্‌লে উপায় কি? মিথ্যাকে মিথ্যা ব'লে মনেই হয় না, যখন মিথ্যার বয়স হয় বেশী এবং তা'র সর্ব্বাঙ্গে কৃত্রিম সত্যের বৈষ্ণবী

মার্কা মারা থাকে। ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে সাধারণতঃ যা'র পূজা চলে, সে দেবতা নয়—মাটি। আসল দেবতা হঠাৎ একদিন যদি মূর্ত্তি থেকে বেরিয়ে এসে নৈবেদ্য ভোজন ক'রতে ব'সে যায়, পুরোহিত যজমান সকলেই সেদিন মূর্চ্ছা যাবে। মূর্চ্ছা ভঙ্গে ডাক প'ড়বে ভূতের ওঝার—আদি এবং অকৃত্রিম দেবতাকে ভূত ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তা'র সঙ্গে পরিচয় নেই। সত্য পুরাতন; কিন্তু ছদ্মবেশী মিথ্যার সভায় তা'র আবির্ভাব আকস্মিক এবং ভয়ঙ্কর। সমাজ চ'ম্‌কে উঠবে, আহত হবে, ভূতের ওঝা ডাকবে, ডামরতন্ত্রের অর্থহীন মন্ত্র আওড়াবে। কিন্তু মিথ্যার ভগ্ন স্তূপের ওপর সত্যের মন্দির-প্রতিষ্ঠা যাঁর ব্রত, তাঁর তা'তে বিচলিত হওয়া চ'লবে না। ব্যবস্থা ক'রতে হবে আরো আঘাতের—আঘাতের ওপর আঘাতের। Aldous Huxley-র কথায় ব'লতে হয়—'The fact that many people should be shocked by what he writes practically imposes it as a duty upon the writer to go on shocking them. For those who are shocked by truth are not only stupid, but morally reprehensible as well; the stupid should be educated, the wicked punished and reformed. All these praise-worthy ends can be attained by shocking.

শরৎ-সাহিত্যের প্রথম আবির্ভাব এম্‌নি ক'রে আমাদের সমাজকে চ'ম্‌কে তুলেছিল, আঘাত দিয়েছিল। 'ঘরে বাইরে'-তে শঙ্কার সঙ্গে সান্ত্বনা ছিল; শরৎচন্দ্র এনেছিলেন শুধু শঙ্কা—তা'র চেয়েও বড়ো—

মৃত্যুশর। রাবণদের বড়ো দুর্দ্দিন! সকলের চেয়ে বড়ো কথা— শরৎচন্দ্র স্বপ্নী নন, Realist. Idealism থে'কে তিনি যে একেবারে নির্ম্মুক্ত এমন কথা ব'ল্লে ভুল হবে, তবে, তা'র পারসেণ্টেজ কম,—খুবই কম। তাঁরো সংস্কার আছে, দুর্ব্বলতা আছে। তাঁরো প্রতিভার দৃক্‌কোণে ব্যক্তিগত স্পর্শের অনুরঞ্জন থাকায় দৃষ্টির refraction আছে। তবু তিনি Realist. রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের এইখানে তফাৎ—আকাশ পাতাল তফাৎ। মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর এবং এই পরিচয়ের মূলে নিবিড়তম, আন্তরিকতম সহানুভূতি। এ-ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ এ-দেশে নেই; রাশিয়ায় আছে, নরওয়েতে আছে। হয়তো বা শরৎ-সাহিত্যে ও-সব দেশের সুরও বাজে, কিন্তু অনাহত। শরৎচন্দ্রের নরনারীরা তাঁর আপনার, তাঁরি পরিবারভুক্ত। তারা চলাফেরা করে তাঁকেই ঘিরে। তাই মাঝে মাঝে তাদের দলে শরৎচন্দ্রকে দেখ্‌তে পাই, তাদের চক্ষে তাঁর অশ্রু দেখি, কণ্ঠে শুনি তাঁরি আনন্দ বেদনার কলরব। বঙ্কিমচন্দ্রের মতন তিনি আপনার চারিপাশে গুরু গৌরবের গণ্ডী টেনে হিতোপদেশ এবং বধোদয় শিক্ষা দেন না। রবীন্দ্রনাথের মতন প্রাচ্যের মাটিতে প্রতীচ্য জীবন গঠনের experiment-ও তিনি করেন না। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর সাধনা ও কালতির সাধনাও নয়। অন্ধ সমাজের তথাকথিত ধর্ম্মাধিকরণে আইন আর তা'র ফাঁকির সূক্ষ্মসূত্রে সত্যভাসিত যুক্তির ঠাসবুনানির ধারায় তাঁর চরিত্রদের পক্ষ নিয়ে বক্তৃতা ক'র্‌তেও তিনি আসেন নি। তিনি চান সত্যকে রূপায়িত ক'র্‌তে in terms of beauty। 'In terms of beauty'—চমৎকার কথা! নইলে

তাঁর সৃষ্টি সাহিত্য হ'তো না; হ'তো হয় দর্শন, না হয় ইতিহাস—teaching philosophy by examples। কথা-সাহিত্যের স্বরূপে তিনি সচেতন—'যা কিছু ঘটে, তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্যবস্তু বলিনে, তেমনি যা' ঘটে না, অথচ সমাজ ও প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘট্‌লে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে'। কথা-সাহিত্য সৃষ্টির সম্পর্কে এর চেয়ে বড়ো কথা হ'তে পারে ব'লে আমি বিশ্বাস করি নে। এইটুকুর ভিতর শরৎশিল্পের মূল সূত্র তো আছেই, আর আছে এরা ওরা এবং আরো অনেকের সম্বন্ধে ইঙ্গিত, হয়তো বা উপদেশ। বঙ্কিম-যুগ হ'তে আজকার অতি-আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত (শরৎচন্দ্রকেও ধ'রে) সমগ্র কথা-সাহিত্যের স্বরূপ-পরিমিতি এ'তে পাচ্ছি।

'শেষ-প্রশ্ন' বেরোনোর পর কা'রুর কা'রুর মুখে শুনেছি শরৎচন্দ্র এইবার পাকা Preacher-এর ভূমিকায় নেমেছেন Bojer-Deledda-Lagerlof-এর মতন, হয়তো বা একপ্রকার বঙ্কিমচন্দ্রেরো মতন। সত্যই তাই নাকি? আমি মোটেই তা' মনে করি না। রমা, সৌদামিনী, অচলা, পিয়ারী-বাইজী, কিরণময়ী—তা'রপর? কমল? নিশ্চয় কমল। কমল একটু বেশী কথা বলে, এক কথাই অনেকবার বলে। তবু কমল সত্য, কমল স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত—বিলেত থেকে আমদানি করা এক বাণ্ডিল তর্ক নয়। তা' ছাড়া, কমল না হ'লে ভারতী যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, মাত্র তা'র আধখানা পাই। দুটির জন্মসূত্রে ডিগ্রীর তারতম্য আছে, কিন্তু প্রকার এক। ভারতী ও কমল একই সত্যের দুই দিক্‌। ভারতীর মধ্যে

কমল বুদ্ধিমতী, প্রাণবতী; কিন্তু তা'র শক্তি কম। কমলে কুমুদ শক্তিমতী, বুদ্ধি এবং প্রাণ তো আছেই। প্রথম ভূমিকায় কমল হয়তো ঠিক ক্ষেত্রে পড়ে নি। দ্বিতীয় ভূমিকায় সে আপন ক্ষেত্রে মহিমময়ী অধীশ্বরী—সবাই তা'র কাছে হার মেনেছে, পুরুষ নারী সব। কমল হয়তো একটু ultra-modern; হয়তো তা'র ধাতুতে একটু Americanism আছে। তবু কমল স্বাভাবিক—সাহিত্যের দিক্ দিয়েও স্বাভাবিক, বাঙ্‌লার একচক্ষু সমাজের নিস্পেষণে আহতচেতনা নারীর উদ্বোধনের দিক্ দিয়েও স্বাভাবিক 'কেটি সিসি'দের সঙ্গে তা'র সগোত্রত্ব নেই। 'শেষের কবিতা' এদেশের তরুণ সাহিত্যের ওপর শ্লেষ, না তা'র ওপর বিজয় অভিযান বোঝা কঠিন। দু'দিকেই সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়ে'র সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের শেষ হওয়ার আগে তা'র ওপর কোনো মন্তব্য করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়।

মোটের ওপর স্রষ্টা হিসাবে শরৎচন্দ্র দক্ষ। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টিতে দক্ষতার নিদর্শন একদিকের চেয়ে আর এক দিকে বেশী উজ্জ্বল। নারীর ওপর তাঁর দরদও বেশী, ওদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাও বেশী। তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরুষ-চরিত্র দেবদাস, সুরেশ, শ্রীকান্ত, সতীশদের চেয়ে সাধারণ নারীচরিত্র বড়দিদি, বিজয়া, 'পোড়াকাঠ', নির্ম্মলারাও ঢের বেশী ভালো ফুটেছে—অসাধারণদের তো কথাই নেই। কিন্তু তাই ব'লে আমাকে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। আমি এমন কথা বল্‌তে চাই না যে পুরুষ চরিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্রের আপেক্ষিক অক্ষমতা আছে। আমার বিশ্বাস মোটেই তা' নয়। ওদের ওপর তাঁর সহানুভূতিও কম নয়—

ওরা যে আপনার ফাঁদে আপনি জড়িয়ে প'ড়েছে, শোচনীয় ভাবে জড়িয়ে প'ড়েছে। তবু নারীর ওপর তাঁর দরদ বেশী; হেতু এই যে ওরা চিরকালের বঞ্চিত—মনু-রঘুনন্দনেরা পুরুষ ছিল।

একটা কথা শুনতে পাই—শরৎচন্দ্র পতিতার সাহিত্যিক, ওইখানেই তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্র; শরৎ-সাহিত্য অশ্লীল, Kuprin-Artzybashev-এর মতন। এক কথায় শরৎ-সাহিত্য যৌনধর্ম্মী। যাঁরা একটু বেশী সমজ্‌দার, তাঁরা আবার বলেন—পতিতারই সাহিত্যিক উনি; তবে, ওদের মধ্যেও যে ভালো আছে, তাই দেখাতেই ওঁর সাহিত্য-সাধনা। এ-সবের প্রতিবাদ মানেই দুর্ব্বলতা। একটা মাত্র কথা ব'লতে চাই—এ সব নিতান্তই ব্যক্তিগত মত, রুচি থে'কে যা'র জন্ম; সূক্ষ্ম বিচারের বাইরে এদের স্থান।

শরৎ-সাহিত্যে আমি কিন্তু দেখি স্বতন্ত্র বস্তু। দেখি (তথাকথিত) পতিতাদের পতনের মূল কারণটি আর তা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদের তলে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠও বাজে—কান পেতে তা'ও শুনি। কিন্তু পতিতারাই তাঁর সাহিত্যের সর্ব্বস্ব নয়—সর্ব্বস্ব নারী। পাতিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, কথাটা আপেক্ষিক। আগে নারী, পরে বধূ এবং সতীত্ব দেহধর্ম্ম নয়—শরৎচন্দ্রের মুখেই শুনেছি। পবিত্র-অপবিত্রের ভেদ শরৎচন্দ্রও করেন। দেহে মনে যে অপবিত্র, সে নারীই হো'ক্ আর পুরুষই হো'ক্, তা'র ওপর তাঁর অনুরাগ নেই। কালোকে কালো তিনিও বলেন—নুনকে চিনি মনে করার মতন মন তাঁর নয়। মন্দের ওকালতি ক'রতে কোনও সাহিত্যিকই সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলিয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে

আপনার কর্ত্তব্য ব'লে জ্ঞান করে না'—তাঁরি কথা এবং এ কথার মর্য্যাদা তিনি রে'খেছেন। মন্দের ওকালতি তিনি করেন নি, রঙীন মিথ্যায় ভুলিয়ে নীতি শিক্ষাও দেন নি। সত্য যা' তা'রি রূপটি তিনি নানান্তর ভাবে দেখিয়েছেন। এ উদ্দেশ্য-সাধনের সহজ উপায় কথা-সাহিত্য ; সেই পন্থাই তিনি অবলম্বন ক'রেছেন। সত্যকে রূপায়িত ক'রেছেন—আবার বলি in terms of beauty। আমেরিকার উপন্যাসকারদের মতন Plot-mania তাঁর নেই ; আছে রাশিয়ানদের মতন Cause-এর ওপর অগাধ অনুরাগ। আর আছে অসাধারণ প্রকাশ শক্তি,—বলিষ্ঠ ভাষা, তীক্ষ্ণ বাক্পটুতা। এটুকু তাঁর বিজ্ঞান-আলোচনার ফল—তিনিই ব'লেছেন। Chekov-এর কথা মনে পড়ে,—তাঁর Scientific training was of great service. Chekov ডাক্তার ছিলেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কথা-সাহিত্যিক Aldous Huxley-ও by nature a natural historian। তবে Huxley-র আরো একটা উদ্দেশ্য আছে—'I am ambitious to add my quota to the sum of particularised beauty-truths about man and his relations with the world about him'. তবু তাঁর কথা-সাহিত্যে এই বিজ্ঞান-জ্ঞানের সিদ্ধি আছে প্রকাশের দিকে। এই প্রকাশের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র a novelist with the genius of a dramatist ; তবু নাট্যকার হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—তিনি কথা-সাহিত্যিক।

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুকুমার সরকার

জীবন-তমিস্র-মেঘে বিস্ময়ের নব জ্যোতির্ম্ময়
হোলো আজি আবির্ভূত ! আলোকে তাহার কথা কয়
মানব-মানস-দীঘি ; সে আলোক-ছায়া পড়ে ধীরে
জীবনের ছোটো সুখ, ছোটো দুঃখ, হাসি-কান্না ঘিরে।
সৃজনের আদি হ'তে যে-রহস্যে মানব মানবী
হৃদয়ের স্বপ্নমন্ত্রে মিলন ও বিচ্ছেদের ছবি
নিয়ত অন্তরে আঁকে ; যে-নিরাশা-আশার কল্লোল
পাওয়া, না-পাওয়ারে ঘিরে নিত্য দেয় জীবনেরে দোল !
তা'রা যে মুখর হোলো হে বাঙ্ময়, তোমার বাণীতে
তুমি ত কল্পনা নহ ; বাস্তবের দরদীয়া গীতে
এসেছ জীবনে বন্ধু ; হে মোদের মহা-অনুভব
মোদের হাসির সুরে মেশে তব হাসি অভিনব।
শতেক ব্যর্থতা আর জীবনের সহস্র বঞ্চনা
সব যে সার্থক হোলো লভি' তব অনুভূতি-কণা
অপরূপ মমতার ; যে-সত্য ঘৃণিত হ'য়ে আছে
ছদ্মবেশী মানুষের জরাজীর্ণ অন্তরের কাছে ;
যে-সত্য 'গুমরি' কাঁদে সাবিত্রীর আঁখির উৎপলে
কিরণ পাগল হয় যে-সত্যের অগ্নি-বাষ্পতলে।

শরৎ-বন্দনা

আঁধারের অঙ্কে বসি' চন্দ্রমুখী যে সত্যের আলো,
আপন অন্তর-লোকে অকস্মাৎ একদা জ্বালালো
শত শত দেবদাস যে সত্য হারায়ে ঘর ছাড়ে
শতেক পিয়ারী হয় রাজলক্ষ্মী যে-সত্যের দ্বারে
তুমি সেই সত্যদ্রষ্টা ; ওগো বন্ধু বলিতে কি পারো
মানস-তনয়া তব রমা কত, কত কাল আরো
কাটাবে বঞ্চিত দিন ; অভিমান-বিচ্ছেদ-আড়ালে
তোমার সে বিন্দুমাতা আজিও কি প্রাণদীপ জ্বালে
স্নেহের বর্ত্তিকা দিয়ে ; মাধবী কি বড়দিদি রূপে
অন্তর-ব্যথায় দেয় আজিও সান্ত্বনা চুপে চুপে
তোমার বিরহী বুকে ; কামনার বহ্নিদাহ নিয়া
মৃত্যুর ওপার হ'তে রোমাঞ্চি' ওঠে কি আজো হিয়া
উপভোগী স্বরেশের ; অচলা কি লভিয়াছে ক্ষমা
সে অভিশাপের যাহা তা'র পরে রহিয়াছে জমা
ক্ষমাহীন সমাজের ; কমলের দুর্ব্বিষহ প্রাণ
উদ্ধত বিদ্রোহভরে গাহে যেই জীবনের গান।
যে বুদ্ধি-প্রখরা প্রিয়া তীক্ষ্ণতম অন্তরের তেজে
জ্যোতির্ম্ময় বারতায় বন্ধন ছিঁড়িয়া ওঠে বেজে ;
দীর্ণ করি' ছিন্ন করি' অতীতের সংস্কারের মোহ,
নব নারীত্বের যুগে শ্রেষ্ঠতম যে ভাব-বিদ্রোহ
সে আজি ওঠে কি রণি' মহামুক্তি-সঙ্গীতের মত,
হে বন্ধু, প্রাণের কাছে সংস্কার কি হোলো পদানত ?

শিল্পী শরৎচন্দ্র

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী

রঙ্ ও রেখা যেমন রেখাচিত্রের প্রাণ,—সহজ, সবল তুলির টানে যেমন সেই চিত্র সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া দর্শকের নয়ন ও মন ভুলায়, ছোট গল্পে ও উপন্যাসে তেমনি সবল, সহজ, সাবলীল ভাষা ও চরিত্র-সৃষ্টিই প্রধান ও প্রয়োজনীয় বস্তু। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে মিল রাখিয়া যে উপন্যাস রচিত হয়, যে উপন্যাসে মানব মনের নিগূঢ় তত্ত্ব, ছোট খাট সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, আশা, নিরাশা, প্রেম ও কাম একই সাথে ছায়াচিত্রের মত পাঠকের চোখে ফুটাইয়া তোলে, তাহা কোন শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীর রেখাঙ্কনের চেয়ে ছোট নয়। সাহিত্য-শিল্পীর তুলি তাঁহার লেখনী, রঙ্ তাঁহার ভাষা, আর রেখা তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি। শরৎচন্দ্র প্রকৃত শিল্পীর মন ও প্রতিভা লইয়া উপন্যাস ও ছোট গল্পের রাজ্যে এক অভিনব এবং অভূতপূর্ব্ব যুগের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। ও দেশে র‍্যাফেল যেমন চিত্র-শিল্পে নবযুগের প্রবর্ত্তক, এ দেশে তেমনি একদিন উপন্যাস ও ছোট গল্পের রাজ্যে শরৎচন্দ্র যুগ-প্রবর্ত্তকরূপে কথা সাহিত্যের বিরাট ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে অজেয় ও একচ্ছত্র সম্রাটরূপে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে, অতর্কিতে সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আর আজও তাহা তেমনি দুরভিগম্য ও সুদৃঢ়ই আছে—অনাগত কালেও হয়ত থাকিবে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রত্যেকটি নায়ক নায়িকা সজীব ও প্রাণবন্ত।

আমাদেরই মত রক্তমাংসে, কথায় ও কল্পনায় তাহাদের প্রত্যেকটির বিকাশ, কোন চরিত্রে কোথাও এতটুকু মানব-মনের তুলনায় গরমিল নাই। কাব্যের নায়ক নায়িকার মত তাহারা শূন্যে শূন্যে পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ায় না, কল্পনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনে তাহাদের কাহারও মুখ ঢাকা পড়ে নাই। কবির ভাষায় তাহারা অর্দ্ধেক মানুষ এবং অর্দ্ধেক কল্পনা; কিন্তু মানব মনের অনুভূতি ও স্পন্দন তাহাদিগকে human atmosphere-এর মধ্যে টানিয়া আনিয়া রূপ দিয়া পুরাপুরি সজীব করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়া তাহারা আমাদের সুমুখে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহারা মানবীয় মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে এই শ্রেণীর রস-রচনায় হাসি ও বিষাদ রসের পরিবেষণই বেশী দেখা যায়। সে যুগের সমস্ত নায়ক নায়িকা পাপ ও পুণ্যের গণ্ডী-বিভাগ দেখাইতে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের আকৃতি মানবীয় কিন্তু প্রকৃতি অবাস্তব। তাহারা ঠিক আমাদের সহিত এক স্তরে এক মাটিতে বিচরণ করে না, মানবীয় মনোবিজ্ঞানের বহু ঊর্দ্ধে তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। গল্প লিখিতে হইলে চরিত্রের প্রয়োজন, নায়ক নায়িকার আবশ্যক, তাই যেন তাহাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কলের পুতুলের মত তাহারা আমাদের সুমুখে আসিয়া দাঁড়ায়, হাসায়, কাঁদায় পরক্ষণেই যবনিকার অন্তরালে সরিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন হইতেও সেই সব নায়ক নায়িকার স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়। তাহাদের

আগমন ও প্রস্থান আমাদের মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করে না। পাঠককে ক্ষণিক আনন্দ বা ক্ষণিক বেদনা দেওয়াই যেন তাহাদের একমাত্র কাজ, আদর্শ প্রচার ও পাপ পুণ্যের ফলাফল নিবেদনই যেন তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র—যিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের প্রবর্ত্তন করিলেন তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি অনেক স্থলে মনস্তত্ব হিসাবে অসম্পূর্ণ। রস-রচনার ত্রুটী যেন তাহাতে ছড়ান রহিয়াছে। চরিত্রগুলিতে তিনি Scientific treatment দিতে চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য উপন্যাস রচনায় সে যুগে যে বঙ্কিমচন্দ্র পথপ্রদর্শক তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই হিসাবেই তিনি আমাদের নমস্ত এবং পূজ্য। কিন্তু সে যুগ এবং এ যুগের মধ্যে একটি গভীর ছেদ পড়িয়া গিয়াছে। মানুষ এখন উপন্যাস ও ছোট গল্পে নিজেদেরই ছায়া, নিজেদেরই প্রতিবিম্ব দেখিতে চায়। আর এই দেখিতে চাওয়ার মূলে, দেখিতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার ও দেখিবার চক্ষু খুলিয়া দিবার গুরু হইলেন শরৎচন্দ্র।

আয়েষা, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, চঞ্চলকুমারী প্রভৃতি যেন মানুষের সমাজের বাহিরের, তাহাদের যেন স্পর্শ করা যায় না, ছবির মত সুদৃশ্য পটভূমিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারা যেন লেখকের হাতের পুতুলের মত হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া গাহিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তাহাদের নিজের স্বতন্ত্র কোন শক্তি নাই, কোন রূপ নাই ; লেখক যে ভাবে ইচ্ছা তাহাদের গড়িয়া লইয়াছেন। পাঠকের হৃদয় ও মনে গভীর রেখাপাত করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা তাহাদের মধ্যে নাই। কিন্তু

শরৎচন্দ্রের যে কোন নায়ক নায়িকার চরিত্রবিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহাই দেখা যায় যে তাহাদের প্রত্যেকেই আমাদেরই মধ্যে বিরাজ করিতেছে, খুঁজিয়া বাছিয়া লইতে হয় মাত্র। রমা রমেশ, পার্ব্বতী দেবদাস, অপূর্ব্ব ভারতী, কিরণময়ী উপীনদা, সাবিত্রী সতীশ, বিজয়া নরেন, রাসবিহারী বিলাস, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী, অন্নদা দিদি, অভয়া, সিদ্ধেশ্বরী গোকুল, শৈল, মহিম, সুরেশ, অচলা, মৃণাল, কুসুম, বৃন্দাবন, মাধবী, সুরেন প্রভৃতি যেন আমাদেরই অন্তরলোকের মানুষ—মনে হয় যেন কোথায় তাহাদের সহিত আমাদের অন্তরের একটি বিশিষ্ট যোগসূত্র রহিয়াছে। পরিশেষে যে কমলকে লইয়া এত হৈ চৈ সেই কমলের মধ্যেও অসামঞ্জস্য এবং অযৌক্তিক কোন আচরণই আমাদের চোখে পড়ে না। বাংলা দেশের নারীর মহিমাকে সে ক্ষুণ্ণ করে নাই। সে তর্ক করিয়াছে, বিপ্লবের পতাকা উড়াইয়া প্রাচীনতম কুসংস্কার এবং অচলায়তনকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য জোর গলায় নিজেকে বিপ্লবী বলিয়া প্রচার করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রাণের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা এই বাংলা দেশের নারীতেই সম্ভব। তাহার হৃদয়-জোড়া প্রেমই তাহাকে মুক্তির পথে আগাইয়া দিয়াছে। আর অজিত, শিবনাথ, নীলিমা, রাজেন, অক্ষয়, হরেন প্রভৃতি আমাদেরই ঘরের লোক, আমাদেরই দেশ ও সমাজের লোক। পাওয়া যায়। তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া, দল পাকাইয়া, হেথা হোথা ছুটিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হয় না; শাশ্বত চিরন্তন নর-নারীর, সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা দুঃখ দারিদ্র্য এবং ঐশ্বর্য্য

বিলাসের মধ্যেই তাহাদের জন্ম, শাশ্বত ও চিরন্তন কালের নর-নারীর হৃদয়ানুভূতি ও মনোবেগ গতি প্রগতির তালে তালে তাল রাখিয়া এই সকল চরিত্র এই পৃথিবীর ধুলিকণার মধ্যেই পদক্ষেপ করিয়া আমাদেরই পাশে পাশে চলিয়াছে। তাহাদের চরিত্রের মধ্যেই এই পৃথিবীর আলো বাতাসে বর্দ্ধিত নর-নারীর চিরন্তন পরিচয় ফুটিয়া রহিয়াছে। পাপ ও পুণ্য, আঘাত ও বেদনা প্রেম ও কাম ভাব ও বিলাস, বাস্তব ও কল্পনা যে ভাবে যেমন করিয়া মানব মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে ঠিক্ সেইভাবে, সেই ধারায় শরৎ সাহিত্যের নায়ক নায়িকা সংযম ও নিষ্ঠার শুচি-শুভ্র মূর্ত্তিতে দীপ্যমান। আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের সৃষ্ট নায়ক নায়িকার ন্যায় তাহারা বিদেশ হইতে আমদানী করা বস্তু নহে, বিদেশীয় হাব ভাব, বিলাসের অনুকরণে তাহারা সৃষ্ট হয় নাই। ডালভাত খাওয়া বাঙ্গালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতি পদে পদে তাহাদের মধ্যে রূপ লইয়া ফুটিয়া ওঠে। যাহা সঙ্গত, যাহা যুক্তিযুক্ত তাহার বাহিরে শরৎ-সাহিত্যের নায়ক নায়িকারা পা দেয় নাই। এই দেশের জলহাওয়ার মতই তাহারা স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও সত্য—কৃত্রিমতার নাম গন্ধ তাহাদের মধ্যে নাই, খাঁটি সোনার নিকষ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতেই তাহারা ভাস্বর ও প্রদীপ্ত।

এইত গেল চরিত্র-সৃষ্টির দিকের কথা। ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া ধরিতে গেলে শরৎ-সাহিত্য এমনি সুন্দর, এমনি minute and detailed যে র‍্যাফেলাইট যুগের রূপ-চিত্রের মতই তাহা অবিমিশ্র এবং অমলিন। Bold এবং touchy ভাষাই শরৎ-সাহিত্যে রূপরেখার কাজ করিয়াছে। সহজ সরল, ছোট খাট কথায়

শরৎচন্দ্র সমস্ত চরিত্রগুলিকে মূর্ত্তিদান করিয়াছেন। অবান্তর অপ্রয়োজনীয় কথার সমাবেশ নাই, মিথ্যা যুক্তি তর্কের অবতারণা নাই। মহাশশ্মানের রূপ বর্ণনায় উচ্ছ্বাসের আড়ম্বর নাই, কোলাহলও কলোচ্ছ্বাস নাই। নায়ক চরিত্রের শক্তি ও সামর্থ্য বুঝাইবার জন্য অলৌকিক ও অবাস্তব কাহিনীর প্রয়োজন হয় না, ছোট খাট একটি বিস্ময়সূচক কথাই তাহা প্রকাশ করিতে যথেষ্ট। হৃদয়ের ব্যথা জানাইবার জন্যও হা-হুতাশের প্রয়োজন হয় না, গুটিকতক কথা ও বলিবার ভঙ্গীতেই তাহা আপনা হইতে একটি হইয়া পড়ে। নায়ক নায়িকার মনের ভিতর যে দ্বন্দ্ব ও কলহ উপস্থিত হয় তাহা ব্যক্ত বাহ্য আচরণের দ্বারা প্রকাশ করিতে যথেষ্ট। কথোপকথনের মধ্যেই অপ্রধান চরিত্রগুলি অনেক সময়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এ সমস্তই শরৎচন্দ্রের নিজস্ব দান।

মহাশ্মশানের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র যে আলেখ্য আমাদের সুমুখে আবরণ উন্মোচন করিয়া ধরেন তাহার সাহিত কোন চিত্রিত চিত্রের তুলনা হয় না। মহাশ্মশানের রূপ বর্ণনা পড়িতে পড়িতে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সেই অন্ধকার নিশীথিনী, সেই ভয়াবহ মহাশ্মশান প্রদীপ্ত হইয়া আমাদের চক্ষুকেও অন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। অনেকে বলেন শরৎচন্দ্র কবি নন্, কিন্তু আমি তাঁহাদের অনুরোধ করিতেছি এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যেন একবার এই মহাশশ্মানের বর্ণনাটি পড়িয়া নেন। "রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ পালা পাহাড় পর্ব্বত, জল-মাটি, বনজঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায়,

ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই আকাশ-বাতাস, এই স্বর্গ মর্ত্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার! অগাধ বারিধি মসিকৃষ্ণ, অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার। সর্ব্বলোকাশ্রয় আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার। কিন্তু সে কি রূপের অভাব? যাহাকে বুঝিনা, জানিনা,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখিনা—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন! তাই রাধার চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল তাহাও ঘনশ্যাম!" ইহার মধ্যে মিল নাই সত্য, কিন্তু ছন্দ ও দোলার অভাব কোথাও নাই এবং বিষয়-বস্তুর বর্ণনা কোন কাব্যের তুলনায় ম্লান নহে। সামান্য অন্ধকার কারই বা চোখে পড়ে? নিত্যই ত রাত্রিতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে কিন্তু এমন করিয়া তুলির টানে ভাষার ঝঙ্কার দিয়া

রাত্রির নিবিড়তম অন্ধকারকে রূপ দিয়া আর কে ফুটাইয়াছে? নিজের অনুভূতি দিয়া চোখের জ্যোতি দিয়া যাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন তাহাকেই নিপুণ চিত্রশিল্পীর মত সুন্দরতম ভাষার আলেখ্য রচনা করিয়া সর্ব্বকালের পাঠককে উপহার দিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র যথার্থ শিল্পীর দরদ লইয়া, যথার্থ শিল্পীর মন ও চোখ লইয়া life as it is ভাষার রঙে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের অন্তর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঘা দেয়, তাই তাহাদের সুখ দুঃখের, হাসি কান্নার, বিলাস ও বাসনার ছোট বড় কাহিনী আমাদের মুগ্ধ করে। এই সমাজের, এই দেশের প্রতি স্তরের প্রতি শ্রেণীর লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড় ঘটনা যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তাহার ফলে যে অভিজ্ঞতা, যে জ্ঞান, যে আনন্দ বেদনা শরৎচন্দ্র প্রতিদিন অন্তরে অন্তরে লাভ করিয়াছেন তাহাই তিনি ভাষার রূপ-রেখায় উজ্জল করিয়া চিত্রিত করিয়া সাধারণকে উপহার দিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র রূপের পূজারী, অসুন্দরের মধ্যেও তিনি সত্য সুন্দরের দেবোজ্জল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সব মন্দিরেই যে দেবতার আসন আছে—তাহাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—অসুন্দর বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই, অবহেলা করেন নাই। মানবতার ঋষি শবৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎতম জন্মদিনে আজ প্রাণের অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না বলিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। তাঁহার সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে, এত

আলোচনা করিবার আছে যে একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই তাহা সম্ভবপর নহে। আজ শুধু প্রার্থনা করি এই আশ্চর্য্য রূপদক্ষ মানুষটি আরও বহু বহু বর্ষ ধরিয়া বাঙ্‌লা সাহিত্যের শরৎ আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া শান্ত স্নিগ্ধ প্রতিভার কিরণ বিকীর্ণ করিতে থাকুন।

শরৎচন্দ্র

শ্রীকৃষ্ণধন দে

বন্দিনী কাঁদে আঁধার পাষাণ পুরে
ইঙ্গিত তা'র বেদনা জানাতে চায়,
নির্ম্মম মোরা, হেসে' সরে' যাই দূরে,—
অশ্রু তাহার পাষাণে ঝরিয়া যায়!
কৌতুকভরে চেয়ে থাকি তা'র পানে,
চেয়ে থাকে নারী দুর্ব্বহ অপমানে,
নিশ্বাসে তা'র অভিশাপ তোলে ফণা,
মোরা উপহাসি' পথ হ'তে সরে যাই,
অশ্রুতে তার ঝরিছে শোণিতকণা,
বুকের পাঁজর পুড়িয়া যে হো'ল ছাই!

কে আসিল শেষে সকরুণ দু'টা আঁখি,
পাষাণ পুরীর খুলে' দিল দৃঢ় দ্বার,
কল্যাণ কর শিরে তা'র দিল রাখি'
মুছাইয়া দিল ব্যথিত অশ্রুধার!

যে বেদনা ছিল সঞ্চিত থরে থরে
তাহারি চরণে ফুল হ'য়ে আজি ঝরে,
"কে এলে দেবতা ?"—নারী ধীরে ধীরে কহে—
"এ কী জয়টীকা আঁকিলে ললাটে মোর !"
"বিজয়িনী নারী, বন্দিনী আর নহে,"
—কহিল দেবতা, নয়নে ঝরিল লোর।

"শরৎচন্দ্র"

শ্রীমতী আশালতা দেবী

আজ যাঁর বন্দনা উৎসব উপলক্ষ্য করে লিখতে বসেচি, তাঁর কথা স্মরণ কর্ত্তেই মনে পড়ল তাঁর রচনার অন্তহীন করুণা, অজস্র মাধুর্য্য। অত্যন্ত গভীর মনোবেগকে কি সংযত ক'রেই না প্রকাশ করা, দু'চারটি কথার ভিতরে অসমাপ্ত আবেগের শিঞ্জন কেমন ক'রে রেখে যাওয়া। ভালবাসার ইতিহাস এত কম কথা ব'লে কোনদিন প্রকাশ হ'তে দেখিনি। ধরা যাক শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'। রমেশ এবং রমার সম্পর্ক যে কী তা'ত বলার প্রয়োজন হয় না—কিন্তু হা-হুতাশের বর্ণনা নেই, যা আছে প্রেমে পড়ার হাজার রকম ঘটা। তাদের ছেলেবেলার ভালবাসা কেমন ক'রে কোথায় গিয়ে পৌঁছেচে সে খবর তাদের দু'জনেরই অবিদিত ছিল না। ভিতরে ভিতরে এর গভীরতা যে কত সীমাহীন তা'কি কারো বুঝতে বাকী থাকে? কিন্তু কতই না স্বল্পায়োজনের মধ্যে। তারকেশ্বরে একবেলা সম্মুখে বসে খাওয়ানো, যতীনকে কাছে ডেকে রমেশের কথা নিয়ে রমার স্নেহ ও শ্রদ্ধায় বিস্ফারিত অথচ সকুণ্ঠ আলাপ এবং শেষের দিকে তার আসন্ন রোগশয্যায় বিশ্বেশ্বরীর সহিত মধুর এবং মর্ম্মান্তিক কথোপকথন, এমনিতর কয়েকটি স্থানের মাঝেই মাত্র তাহাদের দু'জনের কথা আছে। এত অল্প কথা, এই সংযত আচরণ, এরই ভিতর দিয়ে ভালোবাসার দিক-চিহ্নহীন অকূলতার দিকটা প্রকাশ করা যে কিরূপে সম্ভব হয় তা শরৎচন্দ্রের রচনা না পড়লে আমরা জান্তে পারতুম না।

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির লক্ষণ সংযম এবং সরলতা—শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি এত সহজ বলেই তা গ্রহণ করা এত দুরূহ। আলো হাওয়া আমরা এত অনায়াসে পাই, যে তাহার মূল্য চেতনাকে ঘা দেয় না! শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি অনিবার্য্য সহজবেগে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে। প্রথমে মনে হয় এত সোজা বলেই বুঝি বা একে বিশ্বাস করা কঠিন। এত সহজ ভাষায় কেবল গল্প ছাড়া আর কি কিছু বলা চলে? কিন্তু শরৎচন্দ্রের সহজ ভাষার গল্পের ভিতরে এত সমস্যা, এত বেদনা, এত বড় অবিচার চোখে আঙুল দিয়ে নিরন্তর আপনাদের প্রকাশ করতে থাকে, এদের কথা এত গভীরভাবে মনে মুদ্রিত হ'য়ে যায়, যা বড় বড় লাখ কথায় ভর্ত্তি হাজারো রকমের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বই পড়লেও হয় না।

কিন্তু যে কথাটা বল্‌ব বলে বসেছি—শরৎচন্দ্রের বিরাট প্রতিভার অসংখ্য দিক। সকল দিক্ হ'তে কে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে? কেবল একটা দিক—তিনি নারীকে যেমন ক'রে দেখেছেন—তাকে যে শ্রদ্ধা দিয়াছেন আজ সেই কথাই মনে পড়চে। অনেকে বলেন শরৎচন্দ্র নারীকে যে মর্য্যাদা দিতে চেয়েছেন তা' সকল রকমে তাদের প্রাপ্য নয়। তাঁর স্ত্রী-চরিত্র অনেকস্থানে অবাস্তব। এতে স্ত্রীজাতিকে কল্পনার চক্ষে বাড়িয়ে তুলে ধরা ছাড়া আর কোন ফল হয় নি। হাঁ, তাও যদি বুঝ্‌তাম বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনি সতী-সাধ্বীর পুণ্য-কাহিনী গেয়েছেন। কিন্তু এ তিনি করলেন কি! যে নারী ভ্রষ্টা, সমাজে যার স্থান নেই, তারই চরিত্রের মাধুর্য্য, তারই অনিবার হৃদয়-সৌরভ এমন লোভনীয় ক'রে প্রকাশ ক'রতে কেউ বলেছিল? কে নিশ্চয় বলে নি, এ তাঁর সেই সৃষ্টির তাগিদ যা সকল ফরমায়েসের বাইরে। নারীর চিত্তলোক

উন্মুক্ত ক'রে দেখাবার এ যেন একটা নূতন দিক। শরৎচন্দ্রের আগে বঙ্কিমচন্দ্রের আমল অবধি আমরা দেখতে পাই স্ত্রীলোকের দেহের শুদ্ধতার হিসাবই তার পরিচয়ের সবটা—এর বাইরে আর সমস্তই লেপে মুছে একাকার। যে স্ত্রীলোক কোনপ্রকারে একবার এর বাইরে চ'লে গেছে তার চরিত্রে আর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নেই। তাই যে রোহিণী দৃপ্তা আত্মমর্য্যাদাময়ী অতুল প্রেমশালিনী ছিল, যে শুদ্ধ মাত্র ভালবেসেই বারুণীর জলতলে প্রাণ দিতে গিয়েছিল, স্নেহাস্পদের জন্য অসম্ভবের চেয়েও অতিরিক্ত অসাধ্য সাধন ক'রতে ব'সেছিল, তার চরিত্রের সকল চিহ্ন মুছে গেছে যখন সে গৃহ-ত্যাগিনী। আগেকার রোহিনী মরল, যে রইল সে শুধু এ সংসারে পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয় দেখাতে পারে—আর কিছু পারে না। তাই পাঁচ মিনিটের দেখায় নিশানাথকে দেখে গোবিন্দলালকে বলচে, 'যতদিন তুমি পায় রাখ ততদিন তোমার, তারপর যে রাখে তার।' কারণ এ জগতে যারা পাপিষ্ঠা তাদের এইরূপ বলাই নাকি নিয়ম। কিন্তু এ ত' সমাজসংস্কারকের কথা—এখানে স্রষ্টা কই, যাঁর দরদের শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না, সমবেদনার অশ্রুভারে যিনি সজল। শরৎচন্দ্র সংস্কারকে আমল দেন নি, তাই তাঁর লেখায় নারীর সত্যরূপ দেখ্‌তে পাই। যে নারী সমাজের বাইরে পা দিয়েছে তার মন্দভাগ্য হ'তে পারে কিন্তু সকল দিক থেকে তাকে আরও মন্দের দিকে অহর্নিশি ঝুলিয়ে দেবার যত প্রকার ফন্দী আছে আগাগোড়া রচনায় তিনি তার একটাকেও গ্রহণ করেন নি। তাই তাঁর সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে

ফুটেছে। একদা হয়ত তাদের দেহের বিচ্যুতি ঘটেছিল কিন্তু মানুষে যে এই একটা কথাকেই অনুক্ষণ জপ করে না, একে ছাড়িয়েও তার চিত্ত অসীম, মন বিচিত্রতর, একদিনের কোন গভীর অপরাধও যে তার জীবনের আকাশকে নিশিদিন কালিমাময় ক'রে রাখ্‌তে পারে না এবং এ কথা যে স্ত্রীলোকের পক্ষেও নিরতিশয় সত্য এ তিনি কোন ছলেই ঢেকে রাখ্‌তে চাননি। এইখানেই বোধ করি শরৎচন্দ্রের বঙ্কিম যুগের সোপান থেকে নেমে আসা। 'চন্দ্রশেখরের' শৈবলিনী তাহার গৃহবিচ্ছেদের অবকাশে কিরূপে আপন দেহকে পবিত্র রেখেছিল, তা প্রমাণ করবার কি উগ্র ব্যস্ততা, কি অরুচিকর দীর্ঘ আলোচনা; এইটুকু প্রমাণ করতে কত কি চাই, রমানন্দ-স্বামীর Psychic force চাই, ফষ্টারের বেঁচে থাকা চাই, আরও কত সহস্রবিধ উপায় চাই; এবং আখ্যায়িকার আরম্ভ হ'তেই শৈবলিনীর মত পাপিষ্ঠা চিত্রের অবতারণায় লেখকের লেখনী কিরূপ কলুষিত হ'য়েছে তার বারংবার বহুল বর্ণনা চাই - যেন প্রথম থেকেই একটা গভীর দুষ্কৃতির কৈফিয়ৎ দিবার সুর লেগে রয়েছে। অথচ সাহসে, তেজস্বিতায়, প্রেমে, তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিতে শৈবলিনী অসাধারণ চরিত্রের অধিকারিণী, তাকে পাপিয়সী ব'লে স্মরণ হয় না। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র কয়েকটি কথা মনে পড়লো—অপূর্ব্ব বর্ম্মা ত্যাগ ক'রে সুদূর বাঙলা দেশে ফিরে যাওয়ার পর চিরদিনের সংস্কার-জড়িত দুর্ব্বলতায় তা'কে সন্দেহ ক'রতে কেহ কাছে নেই ব'লে। ভারতী নিজেই আপনার আচরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ এবং সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে সব্যসাচী ভারতীকে ব'লচে "তোমার ভালবাসার তুলনা নাই, সেখান থেকে

অপূর্ব্বকে কেউ সরাতে পারবে না, কিন্তু নিজেকে তার গ্রহণযোগ্য ক'রে রাখবার আজ থেকে এই যে জীবনব্যাপী অতি সতর্ক সাধনা সুরু হবে, তার প্রতিদিনের অসম্মানের গ্লানি মনুষ্যত্বকে যে তোমার একেবারে খর্ব্ব ক'রে দেবে ভারতি, হায় রে এমন চিরশুদ্ধ হৃদয়ের মূল্য যেখানে নেই সেখানে এমনি ক'রেই বোঝাতে হয়। পদ্মফুল চিবিয়ে না খেয়ে যারা তৃপ্তি পায় না, দেহের শুদ্ধতা দিয়ে এমনি করেই কান মলে তাদের কাছে দাম আদায় করতে হয়। হবেও হয়ত।' এমন কি শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর মুখ দিয়ে স্বচ্ছন্দে বলালেন "অপূর্ব্বর সঙ্গে দেখা তোমার একদিন হবেই কিন্তু ততদিনে সব্যসাচীর বোন ব'লে গর্ব্ব করবার আর যে কিছুই বাকী থাকবে না, ভারতি।" আত্মশ্রদ্ধার, আত্মপ্রত্যয়ের এই অভাব যা বহুদিনের সামাজিক ফরমায়েসের চাপে আজ পর্ব্বতপ্রমাণ হ'য়ে নারীর সব চেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েচে, তার থেকে এই মুক্তি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মাঝে এমনই মধুর হ'য়ে প্রকাশ পেয়েচে, যে যে কোন স্ত্রীলোক সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে তাকে গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারে ?

একদা শরৎচন্দ্র কোন একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, সতীত্বের সহিত এক বস্তু নয়। যৌন-শুদ্ধাচারের যেমন দাম আছে তেমনই সে দামকে সর্ব্বব্যাপী ক'রেও লাভ নেই। যে মেয়ে শুদ্ধান্তঃপুরিকার গর্ব্বে গরবিনী তিনি ও যে মিথ্যাভাষণে, দুর্ব্বলতায়, পরপীড়নে, বড় কারও কম যান না এ যে প্রায়ই দেখা যায়, এ কথা কি অস্বীকার করবার যো আছে—বস্তুতঃ এ দুটো জিনিষকে একাকার ক'রে দেখার মত ভুল আর নেই। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যে কেবল সতীত্বের সহিত একান্ত এক নয় এবং এর চেয়ে ঢের বড় এবং ঢের সর্ব্বাঙ্গীন সে কথা সামাজিক

এবং সাংসারিক দিক থেকে না হোক্ বুদ্ধির দিক থেকে কে না চট্ ক'রে বুঝতে পারে? অবশ্য স্বীকার করা বা অস্বীকার করার কথা আমি বলচিনে। অথচ এই ধরণের কথা শুনে সেদিন উত্তেজনার আর অন্ত রইলনা। ওঁরা ব'ললেন শরৎচন্দ্রের কাজই এই-পাপের রমণীয় ক'রে আঁকতে তাঁর জুড়ি মেলেনা—নইলে চন্দ্রমুখীই কি স্বাভাবিক, না সাবিত্রীর মত দাসী কেউ কোনদিন দেখেচে? এ বস্তু বাস্তব জগতে মেলে নাকি? দু'টি চক্ষু কতদিন ধ'রে প্রতীক্ষায় মেলে থাকলে একটি কমল বা একটী অভয়ার সাক্ষাৎ মেলে তার হিসাব না হয় এখন থাক, কিন্তু নারীকে আত্ম-অশ্রদ্ধার চরম অবমাননা থেকে যিনি আপন অপরূপ সৃষ্টির রস দিয়ে অনেক পরিমাণে বাঁচিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকে কি ব'লে অভিনন্দন ক'রব ভেবে পাইনে।

এইত তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে সমালোচনার আর শেষ দেখচি নে। কমলকে নিয়ে কটুকথা এবং উত্তেজনাও অনেক হ'ল। কেউ বলচেন ও-বস্তু নিয়ে ত য়ুরোপে বহুদিন থেকে ফেলা ছড়া হ'চ্ছে আজ তারই কিছু ভুক্তাবশেষ নিয়ে কমলের ওপর পরিবেষণের ভার দেওয়া হয়েচে। কেউ ব'লচেন কমল য়ুরোপ থেকে আমদানীকরা বাসী এক বাণ্ডিল তর্ক। কিন্তু তর্কের উত্তাপে কমলের দিকে বোধ হয় একবারও কেউ চোখ চেয়ে দেখচেন না।

কেবল দেহের ওপর সতর্ক পাহারা রাখাই স্ত্রীলোকের চরম পরিচয় নয়। বিরাট জীবনের অপরিসীম বিস্তার, অপরাজেয় আনন্দ, ব্যথার সমুদ্র, এ সমস্তকেই এই একটি বিন্দুতে নিয়ে এসে অহরহ মাপজোঁক ক'রতে বসা বিড়ম্বনা, তাকি কমল ছাড়া এত সাহস ক'রে কেউ

ভেবেচে ? যাকগে সাহসের কথা, কারণ কমলের কাছে ও শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, ব'াহুল্য—কিন্তু এমন সর্ব্বস্ব দিয়ে সারা জীবনকে কেউ গ্রহণ করতে পেরেচে ? গ্যেটে ছিলেন বিরাট প্রতিভাবান পুরুষ কিন্তু তিনি ক'বার প্রেম করেচেন ?কমল এতখানিই দাবী করেচে। তার কাছে বিবাহ অনেক ঘটনার মত একটা ঘটনামাত্র। এরই ভুল অথবা দুর্ভাগ্য দিয়ে একজন নারীর পূর্ণ মনুষ্যত্বকে মাপা যায় না এবং এইটেই তার প্রচ্ছন্ন মর্য্যাদাবোধ, তার মমতা, তার করুণা, মাধুর্য্য, কর্ম্মক্ষমতা এ সকল গুণের এক এবং অদ্বিতীয় আধার নয়। কমল আর যাই হোক্ সমাজের বিরুদ্ধে নিরন্তর দুঃসাহসিক মতামত প্রকাশ করেচে বলেই যে সে মডার্ণ বা অতি-আধুনিকের সস্তা ফল এমন মনে করা সব চেয়ে ভুল। কমল যে মডার্ণ নয় (যে অর্থে আলাপ আলোচনা কালে প্রায়শঃ এই কথাটা ব্যবহার হয়) তা বেলা এবং নীলিমাকে একটু অবহিত হ'য়ে দেখলেই টের পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কমলের এই দিকটা পরিস্ফুট করতেই যেন বেলা এসেচে। কমল য়ুরোপের আমদানী এক বাণ্ডিল তর্ক নয়, তার সৃষ্টির উপাদান শরৎ চন্দ্রের পূর্ব্বেকার সকল নারী চরিত্রের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে রয়েচে—তার দুঃসাহসিক মত প্রকাশ ছাড়া তেজস্বিতায় যে সুনন্দা, যে পল্লীগ্রামের মেয়েটি শুদ্ধ মাত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে স্বচ্ছল গৃহের সমস্ত আরাম উপেক্ষা ক'রে স্বামীকে ক্ষেতের বেগুন বিক্রয় করতে প্রবৃত্তি দিয়েছিল—শিবনাথের অসত্য পরায়ণ বঞ্চনার পর কমল কি করে দিনাতিপাত করেচে তা কতখানি তেজ থাকলে সম্ভব হয় সে শরৎচন্দ্রের মানসীরাই জানে, মডার্ণ আইনে নিঃসন্দেহেই এ রাস্তা বাতলায় না। সহিষ্ণুতায়,

শুদ্ধাচারে, সেবায়, উপবাসে, নিষ্ঠায় সে রাজলক্ষ্মী সাবিত্রীর একই প্রকরণের।

শরৎচন্দ্রের লেখায় এত বড় বাস্তববাদ এবং অত বড় আদর্শবাদ কি করে একীভূত হ'য়ে রয়েচে ভেবে বিস্ময়ের শেষ পাওয়া যায় না। এর একটা মাত্র কথা ধরা যাক। আজকাল নিরতিশয় বাস্তববাদীরা নানা আয়োজনে নানা ভঙ্গিমাতেও যে কথাটা ঠিকমত ব'লতে পারচেন না—নারীরূপের কথা ইনি কত সহজে কি সুন্দর ক'রে, অথচ কত বাস্তবভাবে বলেচেন! চরিত্রহীনে কিরণময়ীর দিবাকরের সঙ্গে যে বহুখ্যাত কথোপকথন আছে তারই একটা জায়গায় সে বলচে "আমার নিজেকে দেখে কি মনে হয় জান? মনে হয় সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সব চেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা।" কিংবা শেষপ্রশ্নের 'একদিন যে দিন নারী ছিলাম' সে গল্পচ্ছলেও এই অতিশয় বাস্তব কথাটারই কি সৌন্দর্য্যময় প্রকাশ—'নারীর যা সব চেয়ে বড় সম্পদ্—আপনি যাকে বল্‌ছিলেন তার মা হবার শক্তি—সে শক্তি আজ নিস্তেজ ম্লান; সে আজ সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েচে; এ জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার নিশ্চেতন দেহের উপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার ন্যায় সে সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হ'য়ে গেছে; কিন্তু এত বড় ঐশ্বর্য্য যে এমন স্বল্পায়ুঃ এ বার্ত্তা পৌঁছল তার কাছে আজ শেষ বেলায়।" দিবাকরের সহিত কিরণময়ীর সমস্ত কথাবার্ত্তাটাই রিয়্যালিষ্টিক সাহিত্যে অতিশয় রুচিকর, অথচ এই সকল কথাই এত সহজ এবং সত্য ক'রে বলা যে এরই একটা বিশেষ মাধুর্য্য আছে। তাই আমার মনে হয়

সত্যকার অনুভবের ওপরই সাহিত্যের সব চেয়ে বড় মর্য্যাদা এবং সব চেয়ে বেশী সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। এ ছাড়া এর নীতি অনীতি বাছবার যো নেই। যা সত্যভাবে এবং তীব্রভাবে অনুভূত হ'য়েচে তারই সত্যপ্রকাশ সম্ভব। এইজন্য আধুনিকতম সাহিত্যে কেবল নূতনতর ভঙ্গীর জন্য যে বাস্তব বিচরণ তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাস্তবতার (তাঁহার ভাষায়) সত্য কথা সোজা ক'রে বলার ঢের পার্থক্য। সব চেয়ে বড় সাহিত্যের সবচেয়ে বড় লক্ষণ সে স্বপ্ন দেখায়, শরৎচন্দ্রের প্রেমরচনায় যে স্বপ্ন রয়েচে তার ঘোর দেবদাস, শ্রীকান্ত। পল্লীসমাজ প'ড়ে কার না চোখে লেগেচে। প্রেমের এত বড় দুঃসহ আদর্শ সকল আদর্শবাদকে ছাড়িয়েচে। কিন্তু এ স্বপ্নের আবেশ নিরতিশয় সংযমের ভিতর দিয়ে গ'ড়ে ওঠা। রস-সৃষ্টির আর একটা গোড়াকার কথা হ'চ্ছে যা নিয়ে সহজেই জমান যায় তাকে অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার ক'রতে হয়, যেমন যেবার প্রশ্নপত্র অত্যন্ত সোজা থাকে সেবারে ভালো ছেলেদের পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় পাড়ি দেওয়া ভারি কঠিন। নর-নারীর প্রেম সম্পর্ক এমনই একটা বস্তু যা নিয়ে অতি সহজেই একটা গল্প জমান যায় (অথচ সহজ হ'লেও মানবচিত্তে এর চিরন্তন দাবী লেশমাত্র কম নয়)। তাই আশ্চর্য্য লাগে শরৎচন্দ্র একে কি নিপুণ ক'রেই না ব্যবহার করেচেন। কোথাও বিন্দুপ্রমাণ আতিশয্য নেই, চিরপুরাতনকে স্বকীয় রসে অভিষিক্ত করে তাকে সর্ব্বদিক দিয়ে একটা নতুনরূপ দিয়েচেন, যা তিনি নাহলে আর কেউ পারতেন না। আজকালকার হালআমলের লেখার সহিত তফাত কি তাঁর এখানেই নেই? এঁরা বুঝতে পারেন না যে যে রস নিয়ে সহজেই বাড়াবাড়ি করা যায় তাকে

নিয়েই বাড়াবাড়ি করায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দিক থেকে সর্ব্বপ্রকারে নিষ্ফলতা আসে।

পল্লীসমাজে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধে বৃদ্ধ দীনুর নাতি নাতিনী সমেত ক্ষুধার্ত্ত পঙ্গপালের মত সন্দেশ খেয়ে যাওয়ায়, অরক্ষণীয়াতে হরিপালের দৃষ্টে, শেষপ্রশ্নের মুচিদের বস্তিতে, পথের দাবীর দিন মজুরদের কারখানায়, শ্রীকান্তর মধ্যবিত্ত দুঃস্থ কেরাণীদের জীবনযাত্রার প্রণালীতে দারিদ্র্যের কত রূপই না তিনি দেখিয়েচেন, তবু এর মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন মর্য্যাদাবোধ আছে। খামোখা দারিদ্র্যের নক্ষল আস্ফালনে গল্প জমিয়ে তুলবার ভাব কোন স্থানেই নেই। দারিদ্র্যের ব্যথা স্বভাবতঃই আমাদের মনের একটা দিক স্পর্শ ক'রে বলে এরই ওপর বরাত দিয়ে গল্প বেয়ে নিয়ে যাওয়া, এরই অসঙ্গত বিস্তারে সাহিত্য সৃষ্টি তিনি কোনখানে ক'রতে চান নি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই proportion জ্ঞান, এই সদা সজাগ দৃষ্টি সর্ব্বদাই চোখে পড়ে। কবিতার ছন্দোবন্ধনে একটা সংযত এবং সঙ্কীর্ণ ধারার পথে তাকে চালনা ক'রে এর বেগকে যেমন বাড়ান যায়, তাই ভালো কবিতা অতি সহজেই গদ্যের চেয়ে চট্ ক'রে আমাদে হৃদয়কে স্পর্শ করে। তেমনই শরৎচন্দ্রের রচনারীতির পদ্যের ছন্দোবন্ধনে মত আপনার স্বকীয় মিতভাষণের বন্ধনে অত্যন্ত বেগবান হ'য়েচে! "গৃহদাহ" বইখানি কয়েকবার পড়ার পর আমার মনে হ'য়েছিল এঁর লিখবার রীতি কি সর্ব্বাঙ্গীন এবং কত মনোযোগ দিয়েই না লেখেন। চরিত্র-সৃষ্টি, ভাবের অপরূপ সৌন্দর্য্য এ সমস্ত বাদ দিয়েও এত বড় একটা বইতে খুঁজিলে হয়ত একটা অনাবশ্যক কথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ সমস্তই বাইরের কথা। এমন ক'রে ব'লতে বসলে 'নিরবধিকালে'

শেষ খুঁজে পাওয়া যায়না! কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির রসে কত অক্ষয় আনন্দের দ্বার খুলে গেছে। কত অজস্র নর-নারীর চিত্তে তাঁর জন্য আসন পাতা হ'য়েচে। বহুদিন পূর্ব্বে "নারীর মূল্য পড়ে না জেনেও শ্রদ্ধা বিস্ফারিত চিত্তে বারংবার মনে করেচি শরৎচন্দ্র ছাড়া এমনটি আর কার লেখা হ'তে পারে? ছাদের স্কাইলাইটের আড়ালে অভিভাবকদের লুকিয়ে নভেল পড়ার প্রথমযুগে চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত পড়ে মনে হ'য়েচে, এত বিস্ময়ও জগতে আছে? দেবদাসের মত এত মিষ্টি বই—এর স্নুকোমল রসে কত দিনরাত্রি অভিষিক্ত হয়েচি। বিশেষ ক'রে তাঁর সরল ভাষার জোর, যার অবাধ গতি অত্যন্ত সাধারণকেও অনায়াসে বিদ্ধ ক'রতে পারে। অপরাহ্ণের অবকাশে এই ভাগলপুরের গঙ্গাতীরে ব'সেই কত লোককে ব'লতে শুনেচি এইত সেই শ্রীকান্তের শ্মশানের বটগাছ। তাঁর আসন এতই বিস্তৃত। তাই তিনি এত জনপ্রিয়। সাহিত্য-রসের এই চির দুর্লভ আনন্দ-লোকের ভাণ্ডারে যিনি এত লোকের প্রবেশ পথ খুলে দিয়েচেন তিনি আরও বহু দিন ধ'রে এই অমৃত পরিবেষণ করুন, এই শুধু আজ প্রার্থনা করি।

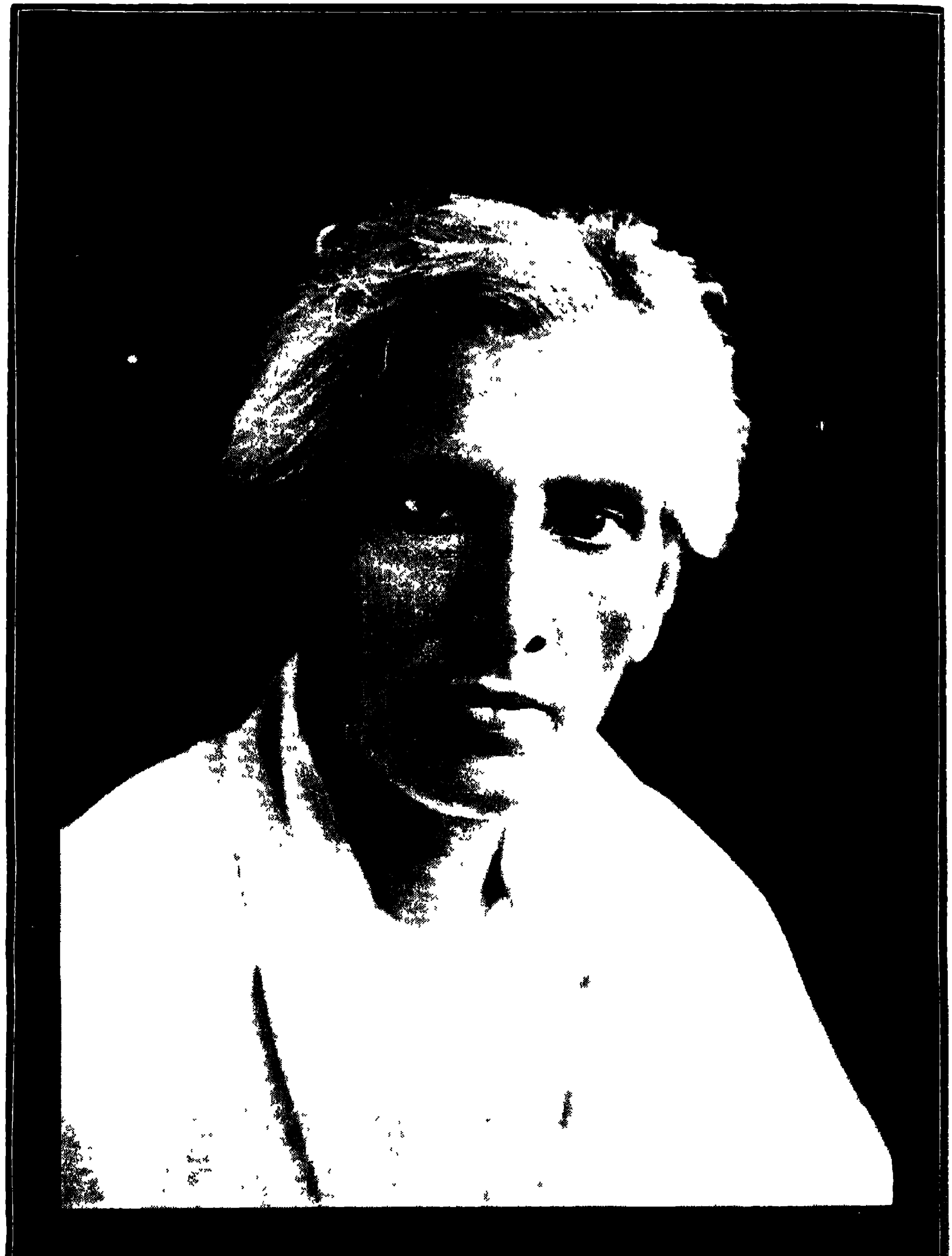

আলোক চিত্রখানি

শরৎ-বন্দনা

শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

চির ব্যথিতের ব্যথার পুষ্পে
গাঁথিয়া স্বচারু হার
দুখেরে যে জন লজ্জা দিয়াছে
তাঁহারে নমস্কার !
পদ-দলিতেরে পথ হ'তে তুলি,
শুচি-অশুচির ব্যবধান ভুলি,
যে জন আপন কল্যাণ করে
মুছায়ে অশ্রুধার—
বুকে তুলে নিল চির লাঞ্ছিতে,
তাঁহারে নমস্কার !
যাঁহার হৃদয়-বীণার তারেতে
নারীর বেদনা ভার
ঝঙ্কারে অতি সকরুণ সুরে
তাঁহারে নমস্কার !
নারীর সত্য পরিচয় পেয়ে
চ'লেছে যে জন তারি জয় গেয়ে,
রমণীর মাঝে নেহারি নীরবে
নব লীলা দেবতার,
যে জন দিয়েছে "নারীর মূল্য"
তাঁহারে নমস্কার !

সমাজের যতো কলঙ্ক কালি
ঘুচাতে চেষ্টা যাঁর;
ব্যথার পূজারী সেই দরদীর
চরণে নমস্কার!
জাতি-কুলমান ভুলি মানবের
ল'য়ে সন্ধান শুধু হৃদয়ের
সত্য মহিমা প্রচারিতে নাই
বিন্দু ভীরুতা যাঁর,
সত্য-পূজারী সে মহামানবে
করিগো নমস্কার!

শেষপ্রশ্ন

[শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

আমি 'শেষপ্রশ্ন' লিখলে লোকে আমার প্রতিভায় অবাক হয়ে যেত। কারণ তা' হলে 'শেষপ্রশ্নের' বিচারই লোকে করত, লেখকের পূর্ব্বতন সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে বইখানার সর্ব্বাঙ্গীন অমিলটা অপরাধ ব'লে গণ্য করত না।

বাস্তবিক, 'শেষপ্রশ্ন' সম্বন্ধে যেখানে যত বিরুদ্ধ সমালোচনা পড়েছি এবং শুনেছি তার মধ্যে এই অভিযোগটিই প্রধান হয়ে উঠেছে যে, শরৎবাবু এ বই লিখলেন কেন? 'শেষপ্রশ্নের' অভিনবত্বে এঁদের বিস্ময় নেই, বইখানায় পরিচিত শরৎচন্দ্রকে খুঁজে না পেয়ে এঁরা ক্ষুব্ধ। বড় লেখকদের এই এক মুস্কিল। তাঁদের লেখার মধ্যে যে জিনিষগুলি Constant অর্থাৎ লিখনভঙ্গী, চরিত্র-চিত্রণপদ্ধতি, রস পরিবেশন-রীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য, এগুলি পাঠকের মনে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে যা'য়। শেষপ্রশ্ন পড়তে বসার আগে আমরা ভাবি, 'চরিত্রহীন, গৃহদাহের শরৎচন্দ্রের লেখা পড়তে বস্‌লাম, শেষ প্রশ্ন পড়বার সময় আমরা মনে রাখি 'শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ছি'। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় এ ধারণা আহত হ'তে থাকলে বইখানার বিরুদ্ধে অভিযোগের আমাদের অন্ত থাকে না।

অথচ, সারাজীবন একভাবে বই লিখে এসে ষ্টাইল টেক্‌নিক সমস্ত বদলে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ভাল বই লেখা বড় প্রতিভারই

পরিচয়। 'ভারতবর্ষে' টুক্‌রো টুকরো শেষপ্রশ্ন পড়ে ব্যাপারটা আমারও ভাল বোধগম্য হয়নি। তারপর একসঙ্গে সমগ্র বইখানা পড়লাম। সবিস্ময়ে ভাবলাম, এত নাম ও প্রতিষ্ঠার বোঝা ব'য়ে নতুন লেখক হবার সাহস শরৎচন্দ্র পেলেন কোথায়?

ভাবনাটা মাঠে মারা গেল না। নতুন লেখকের ভাল বইয়ের মত শেষপ্রশ্নও অযথা নিন্দিত হ'ল।

কবিতার মত ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ পেলেন প্রশংসা, আর একেবারে নতুন কিছু ক'রে শরৎচন্দ্র হলেন অপরাধী।

কথা উঠ্‌বে নতুনত্বই সব নয়। কিন্তু নতুনত্ব শুধু চটক অথবা গুণ সেটা বিচারসাপেক্ষ। চমক দেওয়া অনেক কিছু মানুষকে ঠকিয়েছে ব'লেই সর্ব্বত্র অভিনবত্ব মেকী নয়।

শেষপ্রশ্নের রস-সংযম থেকে রস সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। যে বই কাঁদিয়ে ছাড়ে তার করুণ রসের অসংযম প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দুতে প্রমাণিত হয়ে যায় শরৎবাবুর অনেক বইয়ে দেখা যায় তাঁর দরদ মানুষের প্রতি, বিশেষ করে এই বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তার ভালবাসা, আর্টকে ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি যে দরদ-সর্ব্বস্ব লেখক নন্, আর্টের মর্য্যাদাও যে তিনি বোঝেন, শেষপ্রশ্ন তা নিঃশংসয়রূপে প্রমাণ ক'রেছে।

শেষপ্রশ্নের রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ কলাসম্মত ও গভীর।

উপন্যাসের চরিত্র পাঠকের ইচ্ছা ও ভাল লাগাকেই সমীহ ক'রে পরিণতির দিকে চলবে না, তার গতির মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, এমনকি লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পর্য্যন্ত এড়িয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে

ফুটিয়ে তুলবে। হামসুনের Growth of the soil ভিন্ন আর কোন বইয়ে এ নিয়ম যথাযথ পালিত হ'তে দেখিনি! বাংলা সাহিত্যে এগুণ যদি উল্লেখযোগ্যভাবে কোন বইএ থাকে সে বই শেষপ্রশ্ন। এদিক দিয়ে শেষপ্রশ্নের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এই গুণের জন্য কমল গোরার নারী-সংস্করণ নয়। সে নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ ক'রেছে, সেজন্য পাঠক, লেখক, উপন্যাস রচনার প্রথা কোন কিছুরই মুখ চেয়ে থাকে নি। তার জীবনের ঘটনাস্রোত, তার সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সংস্কার প্রভৃতি যেখানে তাকে ঠেলে এনেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে সে ঘোষণা ক'রেছে, সে স্থানটি তার পক্ষে বিপজ্জনক কিনা সে হিসাব ক'রে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাবার চেষ্টা করে নি।

কমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায়, সে নাকি একটি bundle of speeches. শেষপ্রশ্ন নাকি এদেশের সঙ্গে ওদেশের যুদ্ধের মহাভারত, কমল ওদেশের হ'য়ে একাই যুদ্ধ ক'রেছে। মতের লড়াই শেষপ্রশ্নে নেই এমন নয়, কিন্তু সেটা প্রধান নয়। তর্ক করা কমল-চরিত্রের একটা প্রধান দিক্, এদেশ ওদেশ সমস্যাটা তার তর্কের বিষয় বস্তু মাত্র। আধুনিক মানুষের মনের দুয়ারে আজ সমস্যার ভিড়, মানুষকে আজ অত্যন্ত মাথা ঘামাতে হয়, মস্তিষ্কের পরিচয় না দিলে আজকের মানুষের অর্দ্ধেক পরিচয়ের বেশী দেওয়া যায় না। কমল যা বলে তা সত্য কি মিথ্যা সেটা তাই বড় কথা নয়। অত কথা সে কেন বলে এ প্রশ্নও অচল। তার বলার মধ্যে তার চরিত্রের যতখানি মস্তিষ্কের অধিকার ততখানি পরিস্কার ফুটে উঠেছে কিনা সেইটুকুই বিচার্য্য।

অর্থাৎ তর্ক বড় নয়, বড় কমল নিজে। এই কারণেই শেষপ্রশ্নে কমলের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ নেই, যে অক্ষয়ের মত শুধু লাফালাফি না ক'রে সমানভাবে তর্ক চালাতে পারে। এই কারণেই কমল হবিষ্য করে, তার কথা ও কাজে যে অসামঞ্জস্য বহু সমালোচককে বিচলিত ক'রেছে। নইলে কমলের মত সংস্কার-বর্জ্জিতা রূপসীর দারিদ্র্যে আমিও বিশ্বাস করতাম না।

কিন্তু কমলের হৃদয়কে শরৎচন্দ্র ভুলে থাকেন নি, শেষপ্রশ্নের অন্যান্য নর-নারীর মত কমলের মর্ম্মকোষের পরিচয় যথারীতি অভিব্যক্তি লাভ ক'রেছে। না হলে শেষপ্রশ্নে রসাভাব ঘটত। কিন্তু পূর্ব্বেই ব'লেছি শেষপ্রশ্নের রস-সংযম অসাধারণ, ফেনিল উচ্ছ্বাসের মধ্যে সে রসসৃষ্টি নিজেকে সস্তা করেনি। আপনার কক্ষ্য পথে ঘুরতে ঘুরতে অজিত আর কমল যখন কাছাকাছি এসে পড়েছে, আপনারা তখন তাদের লক্ষ্য করেছেন ?

টেকনিক বলুন, লেখকের রসবোধের গভীরতা বলুন, আর অবস্থা চরিত্র ও প্রকাশ ভঙ্গীর উপর লেখকের সহজ কর্ত্তৃত্বই বলুন, এইগুলি **higher literature**এর লক্ষণ ও ধর্ম্ম। শেষপ্রশ্নে এ সমস্তের সমাবেশ যদি আবিষ্কৃত ও প্রশংসিত না হয়, যদি অর্থহীন নিন্দা ও যুক্তিহীন প্রশংসার মধ্যে শেষপ্রশ্নের সমালোচনা সীমাবদ্ধ থাকে, বাংলার সাহিত্য-রসিকদের পক্ষে সে বড় লজ্জার কথা হবে। নির্ম্মম বিশ্লেষণ ও নিরপেক্ষ বিচার সহ্য করবার ক্ষমতা শেষপ্রশ্নের আছে।

শেষপ্রশ্ন সম্বন্ধে আমার যা বলার ছিল তার কিছুই বলা হ'ল না, উপরন্তু সংক্ষেপে বলার অপরাধ হল। কিন্তু শেষপ্রশ্নের বিশদ আলোচনা

ভবিষ্যতে করা চলবে। শেষপ্রশ্ন যে ভাল বই, অসাধারণ ভাল বই, শরৎ-বন্দনা উপলক্ষ্যে এই কথাটি ব'লে নেবার সুযোগ আমি ছাড়তে পারলাম না।

শরৎচন্দ্র

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাগীশ্বরী-পদে যুগে যুগে যুগে শতেক পূজারী
দিয়া গেছে কত দান নিজ নিজ ভাণ্ডার উজাড়ি'
কত ফুল কত মালা কত রত্ন কত উপহার—
আজি দেখি, আছে মাত্র অবশেষ অতি স্বল্পতার ;
বাকী সব, ঝরে' পড়ে' উড়ে' গেছে শুকায়ে কোথায়—
সেদিনের রত্নরাজি ভার আজি পাষাণের প্রায়।

মন্দিরের পুষ্পোদ্যানে কত ফুল, কত যে কমল
মল্লিকা মালতী যূথী-গন্ধরাজ নীপ সুকোমল—
যে এসেছে—অবচয়ি এ সুগন্ধ কুসুম-সম্ভার,
গাঁথি মালা, শ্রীচরণে উপায়ন দিয়ে গেছে মা'র।
একান্তে একেলা চুপে দাঁড়াইয়া ছিল শেফালিকা—
অজ্ঞাত আরক্ত-মুখী পরিত্যক্তা অস্পৃশ্য বালিকা।

মাতৃপূজা মহোৎসবে মত্ত যবে সবে বিত্তমদে
—ওকে আসে নীলাকাশে, লঘু মেঘ-পথে লঘুপদে ?
প্রান্তরের কাশ-বনে দেখা যায় উত্তরীয় বেশ
বলাকা-শ্রেণীতে উড়ে নিষ্কলঙ্ক উষ্ণীষের শেষ !

বকুলের বাকী, আর শেফালির সুধাশ্রু ঝরিয়া
ফুলময় হ'ল মাটি—চাহিল সকলে সচকিয়া !
'শরৎ' এসেছে, ওরে, শরৎ এসেছে—সবে কয়,
রূপালি হইল নদী, ধান ক্ষেতে কাঁচা সোনা বয় ;
দু'পারে বিরহী দু'টি চখাচখি মানিল বিস্ময়,
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আগমনী আয়োজন হয়।
দেয় সবে ধনরত্ন গন্ধ ফুল মাল্য বাছি বাছি—
'শরৎ' আনিল ঝরা শেফালির মালা একগাছি।

জননী নিলেন হাসি শরতের শেফালির মালা—
ম্লান হ'ল বহুমূল্য রত্নমাল্য অলঙ্কার-আলা।
গিয়াছিল মরে' যারা বাঁচিল তাহারা পুনরায়,
অজানা হইল জানা, হে শরৎ তব করুণায় !
জঙ্গলে কঙ্কালে ত্যক্তে দিলে কোল মহামনীষায়
কথা-সিন্ধু মন্থি, গুণী, বিষ পিয়া বিলালে সুধায়।

নীলকণ্ঠ, গাহি মোরা তব জয়, আজি এ আসরে,—
কথাচ্ছলে ব্যথা তুমি গাঁথিয়াছ অক্ষয় অক্ষরে
ঝরে'-পড়া শেফালিরা তাই তব প্রাণ-প্রিয়তম—
হে দরদী ব্যথারে কে করিয়াছে হেন মনোরম ?
ধন্য মোরা জন্মি' আজি, ধন্য বঙ্গসাহিত্যের পুরী
দিনে যেথা জাগে 'রবি', রাত্রে শরচ্চন্দ্রের-মাধুরী !

ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

মানুষ যে কতখানি বর্ত্তমানের এবং কতখানি অতীতের সে কথা বলা কঠিন। এইখানেই মানুষের জীবনের প্রকৃত দ্বন্দ্ব।

মানুষের মধ্যে দুইটি প্রেরণা কাজ করে; একটি তার সহজ প্রাণধর্ম্মের প্রেরণা, আর একটি তার যুগযুগান্তের সঞ্চিত সংস্কারের প্রেরণা। এই দুইটি বিপরীত প্রেরণা মানুষের চরিত্রকে কোনদিন সহজ, সরল ও স্বাভাবিক হইতে দেয় নাই;—তাহার মধ্যে নানা জটিলতা, নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ যখন তার স্বাভাবিক প্রাণধর্ম্মের প্রেরণায় কোন কিছু করিতে যায়, তখন সে মনে করে, ইহাই ত স্বাভাবিক, ইহাই ত সে করিতে চায়, ইহা করিলেই ত তাহার জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সে অনায়াসে লাভ করিতে পারে। কিন্তু মানুষ জানে না, তাহার চিত্তের গতি শুধু সম্মুখের পানেই নয়;— ভিতর হইতে একটি অজানা আকর্ষণ তাহাকে পশ্চাতের দিকেও টানিতেছে। মানুষ যেখানে বর্ত্তমানের মানুষ সেখানে সে তার প্রাণধর্ম্মের প্রেরণায় তার জীবনের কার্য্যাবলীকে তাহার বাসনানুযায়ী পথে পরিচালিত করিতে চায়, কিন্তু তাহার মধ্যে অতীতকালের যে জীবটি গোপনে বাস করিতেছে সে সহসা গোল বাধাইয়া বসে;— সে এই অবাধ স্বাধীন যাত্রীটির পৃষ্ঠের উপর যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত সংস্কারের বোঝা চাপাইয়া দেয়। বোঝার ভারে পথিকের পদদ্বয়

অবসন্ন হইয়া আসে, তাহার শরীর নুইয়া পড়ে, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে, তাহার পর কখন একসময় তার পথ-চলা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া প্রাণধর্ম্মের সহিত সংস্কারের চিরবিরোধ মানবচিত্তের গভীরতম প্রদেশে অহরহঃ চলিতেছে। এই অলক্ষ্য যুদ্ধের অসহায় আর্ত্তনাদ মানবচিত্ত-ইতিহাসের অধ্যায়গুলিকে চিরকরুণ করিয়া রাখিয়াছে। সংস্কারের সহিত প্রাণধর্ম্মের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এই যে যুদ্ধ, ইহাই মানবচরিত্রকে এত জটিল, এত অপূর্ব্ব, এত রহস্যঘন করিয়া তুলিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানি যখনই পড়ি তখনই এই কথা মনে হয়, যে ইহার মধ্যে এই যে এত বিচিত্র প্রকৃতির নরনারীর সমাবেশ হইয়াছে, ইহারা সকলেই যেন প্রাণধর্ম্ম ও সংস্কারের সংমিশ্রণের বিভিন্ন প্রকারভেদ মাত্র। সোরা, গন্ধক ও কয়লার পরিমাণভেদে যেমন নানাপ্রকারের আতসবাজীর সৃষ্টি হয়, প্রাণধর্ম্ম এবং সংস্কারের সংমিশ্রণের পরিমাণভেদে তেমনি 'শ্রীকান্ত'র অন্তর্গত এত বিচিত্র প্রকারের চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে।

এই যে মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণধর্ম্মের পশ্চাতে তাহা অপেক্ষা প্রবলতর সংস্কার বর্ত্তমাণের মানুষটিকে অতীতের পানে, সম্মুখের যাত্রীটিকে পশ্চাতের পানে অলক্ষ্যে সর্ব্বদা টানিতেছে এবং এই যে তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা, এই যে তাহার সহজ প্রাণধর্ম্ম পশ্চাতের এই প্রবল আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছে—যুঝিতেছে, অথচ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারিতেছে না, ইহারই মর্ম্মান্তিক বেদনা, ইহারই ক্লান্তি, ইহারই অসহায়তা

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানিকে এত করুণ, এত অশ্রুসজল করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র উপন্যাসখানি এই চিরন্তন মানসিক সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস।

এ সংগ্রাম বাহিরের কোন ঘটনার অপেক্ষা রাখে নাই। এ সংগ্রামের তুই পক্ষই মানব-চরিত্রের অন্তর্নিহিত তুইটি বিপরীত চিত্ত-বৃত্তি। ইহাদের একপক্ষে আছে যুগযুগান্তের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত সংস্কার, অপর দিকে আছে মানুষের স্বাভাবিক, সহজ, স্বাধীন প্রাণধর্ম্মের প্রেরণা। সংস্কারের সহিত প্রাণধর্ম্মের এই চিরন্তন সংগ্রামই এই উপন্যাসখানির সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষ করি।

উপন্যাসখানি আরম্ভ হইয়াছে তুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের বন্ধুত্বের ইতিহাসের ভিতর দিয়া। যুবকযুবতীর প্রেমব্যাপারের মত ইহা জটিল বা সূক্ষ্ম বিষয় নয়, কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যেও আমরা এই মানসিক সংগ্রামের ক্ষীণ আভাস পাই। নরনারীর প্রেমের মধ্যে অনেক জটিলতা, অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক সমস্যা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, সুতরাং সেখানে এই মানসিক সংগ্রামের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু তুইটি সমবয়স্ক তরুণ বালকের পরিচয়ের মূলে স্বভাবতঃ কোন জটিলতা বা বিরোধ থাকা সম্ভব নয়। আর যদিই বা থাকে, সে বিরোধ বাহিরের, ভিতরের নয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানি আগাগোড়া কতকগুলি মানসিক সংগ্রামের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস। ইহার মধ্যে যে কেহ আসিয়াছে তাহাকেই এই সর্ব্বগ্রাসী সংগ্রামে সাধ্যানুসারে অল্পবিস্তর যোগদান করিতে হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথের সহিত প্রথমদিনের পরিচয়েই বালক শ্রীকান্তের ছোট্ট বুকখানির মধ্যে সহজ প্রাণধর্ম্মের সহিত সংস্কারের যে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র

সংগ্রামটি বাধিয়াছিল, সে সংগ্রাম যত সামান্যই হউক না কেন, তাহাকে আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। চালাঘরের মধ্যে ছোট্ট একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যে কারণে উপেক্ষণীয় নয়, ঠিক সেই কারণেই ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই:—ফুটবল খেলার মাঠে মুসলমান ছোকরাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত শ্রীকান্তকে আততায়ীদের হাত হইতে বাঁচাইয়া নিরাপদ-স্থানে আনিয়া ফেলিয়া ইন্দ্রনাথ নামক অপিরিচিত বালকটি তাহার হাতের মধ্যে একমুঠা সিদ্ধির পাতা গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে উহা চিবাইতে উপদেশ দিল এবং সে অসম্মতি জানাইলে তাহাকে একটা সিগারেট দিয়া টানিতে বলিল। ইন্দ্রনাথের সহিত শ্রীকান্তের প্রথম পরিচয় হইল এইভাবে। শ্রীকান্ত নিজেই বলিতেছে—"চারিদিকে লোক,—আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম; সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে? 'ফেল্লই বা'! বলিয়া স্বচ্ছন্দে সিগারেট টানিতে টানিতে সে রাস্তার মোড় ফিরিয়া আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।"

ইহার পরই শ্রীকান্ত বলিতেছে,—"আজ আমার সেদিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এই কথাটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না, ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিম্বা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।"

উপরোক্ত দৃশ্যটির ভিতর দিয়া গ্রন্থকার শুধু ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের

প্রথম মিলন ঘটাইলেন না—সেই সঙ্গে অলক্ষিতে প্রাণধর্ম্ম ও সংস্কারের প্রথম বিরোধ ঘটাইলেন। যে মানসিক সংগ্রাম শ্রীকান্ত এবং এই উপন্যাসের অন্যান্য নর-নারীর চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে, সেই সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব্ব এমনি করিয়াই দুইটি অপরিচিত বালকের মুহূর্ত্তের পরিচয়ের ভিতর দিয়া আরম্ভ হইয়া গেল। প্রাণধর্ম্মের সহিত সংস্কারের যে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম সমস্ত উপন্যাসখানির মধ্যে নিদারুণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার বীজের সন্ধান এইখানেই আমরা প্রথম পাইলাম।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সম্বন্ধে যে সকল গল্প এবং কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই ছেলেবেলায় খেলার ছলে সঙ্গীদের সহিত 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলা করিয়া আমোদ পাইতেন। শরৎচন্দ্র তাঁর এই মানসিক যুদ্ধের বিখ্যাত যোদ্ধা শ্রীকান্তকে তার বাল্যের তুচ্ছ ছেলেখেলার ভিতর দিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে এই যুদ্ধ বিদ্যাটির সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত করিয়া রাখিলেন। এমনি করিয়া জীবনের পাঠশালায় শ্রীকান্তের হাতে খড়ি হইয়া গেল।

ইহার পর ইন্দ্রনাথের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া সহজ প্রাণধর্ম্মের যে উদ্দাম অবাধ লীলা সে প্রত্যক্ষ করিল, তাহা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। গভীর রজনীতে গঙ্গাবক্ষে ইন্দ্রনাথের সহিত নৌকা-অভিযানের ভিতর দিয়া কি প্রচণ্ড, কি উদ্দাম প্রাণধর্ম্মের লীলা সে প্রত্যক্ষ করিল। সে অবাধলীলা তাহার চিত্তকে যেমন একদিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল, অন্যদিক হইতে তেমনি

তাহার যুগযুগান্তের সংসারী মন, তাহার জন্ম-জন্মান্তরের ভব্যতার সংস্কার তাহার কানে কানে বার বার করিয়া উপদেশ দিতে লাগিল—"এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়! তোমাকে পড়াশুনা করিয়া মানুষের মত মানুষ হইয়া আর পাঁচজনের মত করিয়াই সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

এমনি একটা দ্বন্দ্ব বুকের মধ্যে লইয়া ইন্দ্রনাথের সহিত প্রথম রজনীর অভিযান শেষ করিয়া শ্রীকান্ত বাসায় ফিরিল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর কখনও সে এই ছন্নছাড়া ভবঘুরে ছেলেটির ছায়া মাড়াইবে না। তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গেল,—ইন্দ্রনাথের সহিত তাহার ইতিমধ্যে একদিনের জন্যও দেখা হয় নাই। মনে হইল বুঝিবা প্রাণধর্ম্মের সহিত যুদ্ধে সংস্কারই জয়ী হইল। কিন্তু শেষ অবধি তাহা হইল না। একদিন একটি নালার ধারে মাছ ধরিতে গিয়া ইন্দ্রনাথের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। মূর্ত্তিমান প্রাণধর্ম্মকে সম্মুখে দেখিয়া শ্রীকান্তের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল সে কথা তাহার নিজের মুখের ভাষাতেই বলি—"যাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনরূপে দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অহরহঃ কাঁটা হইয়াছিলাম, সে এমনি অকস্মাৎ, এতই অভাবনীয় রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল! পাশে গিয়াও বসিলাম; কিন্তু কথা কহিতে পারিলাম না।

এমনি করিয়া ইন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া অপর্য্যাপ্ত প্রাণধর্ম্ম শ্রীকান্তের মনের উপর যখন একটি প্রগাঢ় ছাপ কাটিবার উপক্রম করিতেছিল,

ঠিক সেই সময় তাহার সহিত পরিচয় হইল এমন একটি মহীয়সী নারীর, যিনি আপনার অন্তর্নিহিত সংস্কারজাত সতীধর্ম্মের যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণধর্ম্মকে পুড়াইয়া তাহারই বিভূতি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া ভৈরবী হইয়া বসিয়াছেন।—আমরা অন্নদাদিদির কথা বলিতেছি। ইন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া অপর্য্যাপ্ত প্রাণধর্ম্মের মহিমা যেমন একদিকে তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি অন্নদাদির চরিত্র-মহিমা প্রাণধর্ম্মের উদ্দামতাকে সংস্কারের এই আত্মত্যাগী ভৈরবী মূর্ত্তির সম্মুখে নতমস্তক করিয়া দিল।

এমনি করিয়া প্রাণধর্ম্ম এবং সংস্কারের দুইটি জীবন্ত প্রতিমা শ্রীকান্তের জীবন-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে হঠাৎ দুদিনের জন্য আসিল এবং সহসা একদিন তাহাকে কিছু না জানাইয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। সমস্ত উপন্যাসখানির মধ্যে এই দুইটি নর-নারীকে আমরা আর খুঁজিয়া পাইলাম না।—ইহারা গেল কোথায়?—একথার উত্তরে আমরা বলিব, এই দুইটি নরনারীকে শরীরীভাবে উপন্যাসের মধ্যে কোথাও আলাদা করিয়া পাওয়া যায় না বটে কিন্তু ইহাদের অশরীরী আত্মা শক্তিরূপে সমগ্র উপন্যাসখানির মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র উপন্যাসখানির মধ্যে প্রাণধর্ম্মের সহিত সংস্কারের যে সংগ্রাম চলিয়াছে, সে সংগ্রামের মধ্যে অন্নদাদিদি ও ইন্দ্রনাথকে কি আমরা বার বার পাই না? শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া প্রভৃতির মধ্যে প্রাণধর্ম্ম এবং সংস্কারের যে সংগ্রাম অহোরাত্র চলিয়াছে তাহার মধ্যে ইন্দ্রনাথ এবং অন্নদাদিদিকে কি আমরা অশরীরীভাবে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করি না?

এই সকল সংগ্রামে কখনও বা ইন্দ্রনাথকে জয়ী হইতে দেখিয়াছি, কখনও বা অন্নদাদিদিকে জয়ী হইতে দেখিয়াছি; কখনও বা প্রাণধর্ম্মকে জয়ী হইতে দেখিয়াছি, কখনও বা সংস্কারকে জয়ী হইতে দেখিয়াছি। এমনি করিয়া অন্নদাদিদি ও ইন্দ্রনাথ হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়া সমগ্র উপন্যাসখানির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই তাহাদের স্বতন্ত্র করিয়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রীকান্ত যে কোনদিন সংসারী হইতে পারে নাই, সমাজের বন্ধন, সংসারের বন্ধন যে কোনদিন তাহাকে বাঁধিতে পারিল না, সে যে সহজ প্রাণধর্ম্মের প্রেরণায় চিরদিন ভবঘুরের মত চারিদিকে ঘুরিয়া মরিল—ইহার মধ্যে ইন্দ্রনাথকে কি আমরা ফিরিয়া পাই না? আবার এই সহজ প্রাণধর্ম্মের প্রেরণা যখনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যখনই সে ইহার উদ্দাম বেগ সহিতে না পারিয়া রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে এতটুকু অসংযত হইয়া উঠিয়াছে, অমনি অন্নদাদিদি আসিয়া কি তাহাকে তফাতে সরাইয়া লইয়া যায় নাই?

শ্রীকান্ত একস্থানে বলিয়াছে—"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরে ও ঠেলিয়া ফেলে।"—এই যে 'কাছে টানা', ইহা প্রাণধর্ম্মের কাজ—ইহা ইন্দ্রনাথের কাজ। আর ঐ যে 'দূরে ঠেলিয়া দেওয়ার ব্যাপার' উহা অন্নদাদিদির কাজ। রাজলক্ষ্মীর ভিতর দিয়াও আমরা অন্নদাদি ও ইন্দ্রনাথকে বারে বারে পাই। সেখানেও সেই 'কাছে টানা' এবং 'দূরে ঠেলিয়া দেওয়ার' দ্বন্দ্ব। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়—শ্রীকান্ত এবং রাজলক্ষ্মীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে তাহাতে অন্নদাদিদিই বার বার জয়ী হইয়াছে। অভয়ার মধ্যে কিন্তু

ইন্দ্রনাথকেই বেশি করিয়া দেখিতে পাই। এমনি করিয়া ইন্দ্রনাথ এবং অন্নদাদিদি এই উপন্যাসখানির মধ্যে বার বার আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে,—কে বলে তাহারা উপন্যাসের গোড়াতেই নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে ?

শরৎচন্দ্র

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মধু ও বঙ্কিম ঊষা উদ্‌ভাসিলা এ বঙ্গ-গগন ;
প্রাচীমূলে অরুণিমা নব প্রাণ করে উদ্বোধন ;
ঘরে ঘরে খোলে দ্বার, পাখী গায়, বৃক্ষে নাচে পাতা ;
তটিনী ছুটিল বেগে, ফুল্ল চোখে জাগে বঙ্গমাতা ।

ঊষা-গর্ভ হ'তে রবি বাহিরিল প্রবল-উত্তম,
সুপ্ত গুপ্ত প্রাণাঙ্কুর নব হর্ষে জাগিল দুর্দ্দম ;
সর্ব্ব গ্লানি আহরিয়া সে রচিল বাষ্পঘন মেঘ,—
সে-মেঘ আষাঢ় রূপে ঝরে' ঝরে' দিল প্রাণবেগ ।

শরৎ আসিল স্নিগ্ধ স্বর্ণময় শ্যামল মধুর,
প্রান্তরে সঞ্চিত জল, খানা, ডোবা বিল পরিপূর্ণ ;
দীন ক্ষুদ্রতম তৃণ সেও গর্ব্বে তোলে নম্রশির ;
কদম্বের পাশে ঘেঁটু সেও আজ আনন্দে অস্থির ।

হে বাঙ্গলার সত্য ছেলে, চিত্তে স্বপ্নে হে বাঙ্গালী খাঁটি,
বাঙ্গালীর স্নেহ সুখ দৈন্য প্রেম কথা-কাটাকাটি,
দুষ্ট ছেলে, শান্ত মাতা, তুষ্টা আর রুষ্টা বঙ্গবধূ
যথার্থ আঁকিলে তুমি বাঙ্গালীর দ্বন্দ্ব আর মধু ।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব বক্ষে বেঁধেছিল জগাই মাধাই,
অপূর্ব্ব সে চিত্তসুধা, তারি স্বাদ তব চিত্তে পাই ;
নগণ্য পতিতা ভ্রষ্টা দুষ্টে তুমি দিলে সম প্রেম,
ধূলিতে লভিলে মণি, অকল্যাণে দিলে চিত্তক্ষেম।

প্রচারক শরৎচন্দ্র

শ্রীজগৎমিত্র

কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন নিয়ে বেশ একটা হৈ চৈ হ'য়ে গেল। বইখানির কেউ করলেন নিন্দা, কেউ করলেন প্রশংসা। মোটের ওপর বইখানিকে কেউই অবহেলা করলেন না। সে শুধু শরৎচন্দ্রের রচনা বলেই নয়, উপন্যাসের ক্ষেত্রে শেষপ্রশ্ন যুগান্তর এনেছে ব'লে। তার বিষয় বস্তুর অভিনবত্ব সহজেই মানুষের চোখে পড়লো কিন্তু যিনি গল্প-লেখক তিনি প্রচারকও হ'তে পারেন কি না সেই নিয়ে বাধ্‌লো বচসা। এই বচসার নিষ্পত্তি যে দিন হবে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সে অতি বড় সৌভাগ্যের দিন, সন্দেহ নাই।

নিছক যুক্তি-তর্ক, মতবাদ আর উদ্দেশ্য নিয়ে এর আগে উপন্যাস লিখেছেন অনেক বিদেশীই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে H. G. Wells, Aldous Huxley প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত তাঁদের কোন বইই তেমন প্রাণে লাগে না। তার কারণ তাঁদের লেখায় গল্পের ভাগ কম, তর্কই বেশী। কিন্তু শেষপ্রশ্নে 'কমল'ছাড়া আরো অনেক চরিত্র আছে যাদের জীবনে তর্ক নেই, গল্পই আছে। কমলের জীবনও কিছু কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। সুতরাং শেষপ্রশ্নের সবটুকুই যে উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা, সে অভিযোগ নেহাৎ বাড়াবাড়ি।

অনেকে ব'লেছেন 'শেষপ্রশ্নে' প্রচার আছে, অতএব উপন্যাস হিসেবে তা'র মূল্য কম। এই প্রচার কথাটা নিয়ে আমার একটু

সমালোচনা করবার ইচ্ছে হয়। আমি ভেবে পাইনে সাহিত্যের পক্ষে প্রচার জিনিষটা এতো মারাত্মক কেন। সাহিত্য যদি প্রচার করবে না তাহোলে ক'রবে কি? সাহিত্য বলতে আমরা কি বুঝি, তার কাজ কি, এই নিয়ে অনেক ভেবেছি। ভেবে শেষে এই ঠিক ক'রেছি যে, সাহিত্য আর যাই হোক কেবলমাত্র কতকগুলো উদ্দেশ্যবিহীন কবিতা এবং গল্পের সমষ্টি নয়। সাহিত্যকে আমি জাতীয় জীবনের প্রাণস্বরূপ মনে করি। ব্যক্তি ও সমাজের দুঃখ ব্যথা হাহাকার, তাদের কামনা বাসনা, শুভবুদ্ধি সাহিত্যের মধ্যে রূপ নেবে। সাহিত্য আনবে বৃহত্তর জীবনের আদর্শ। নরনারীকে সে যুগে যুগে নূতন ক'রে গড়ে তুলবে। সুতরাং সাহিত্যের যে একটা উদ্দেশ্য আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সাধারণতঃ প্রচার ব'লতে আমরা মনে করি বক্তৃতা এবং বক্তৃতা ব'লতে কতকগুলো বড় বড় বুকনি—প্রকৃত কর্ম্মজীবনের সঙ্গে যাদের কোন প্রাণের যোগ নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। যে কোন উপায়ে জনসাধারণকে বৃহত্তর কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করার নামই প্রচার-কার্য্য। বক্তা বক্তৃতার সাহায্যে প্রচার করেন, কর্ম্মী করেন কর্ম্মের সাহায্যে, আর গল্প-লেখক গল্পের সাহায্যে। অবশ্য এঁরা যদি দরদী হন, মানুষের দুঃখ ব্যথা এঁরা যদি সত্যই আন্তরিকভাবে অনুভব ক'রে থাকেন তা' হলেই এঁদের বক্তৃতা, কর্ম্ম এবং সাহিত্য-সৃষ্টি মর্ম্মস্পর্শী হ'তে পারে।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষপ্রশ্নে' যে সমস্ত আলোচনা তুলেছেন তা'দের মধ্যে আমরা সংস্কারক শরৎচন্দ্রের চেয়ে দরদী শরৎচন্দ্রের পরিচয় পাই বেশী। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র কখনো এমন কিছু লেখেন নি যা' কেবলমাত্র

তাঁর মুখেরই কথা, অন্তরের নয়। তিনি গল্প লেখেন মানব সমাজের ও মানব চরিত্রের চিরন্তন সমস্যা নিয়ে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে যে সমস্ত অভিমত প্রচার ক'রেছেন তা' আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে কাজে লাগ্‌বে।

কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি বিস্মিত হ'চ্ছি যে আমরা কি এই প্রথম শরৎচন্দ্রকে প্রচারকরূপে চিন্‌লাম? শুধু শেষপ্রশ্ন কেন অন্যান্য অনেক উপন্যাসেই শরৎচন্দ্র নরনারী সম্বন্ধে, সমাজ-সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন অভিমত প্রচার ক'রেছেন। শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে যে তিনি তাঁর লেখার মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়েছেন, কোথাও এতোটুকু নিজেকে লুকোন নি। তাঁর লেখায় আমরা যতোগুলি উল্লেখযোগ্য চরিত্র পেয়েছি তাদের মধ্যে লেখক নিজেও অবিচ্ছিন্নভাবে আছেন। এমন কি যেখানে শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেন নি সেখানেও গল্পের পরিণতি বা চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে আমরা প্রচারক শরৎচন্দ্রকে চিনেছি।

শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অভয়া, কিরণময়ী প্রভৃতি তাঁর এই প্রচার কার্য্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি এঁদের জীবন কাহিনী এঁকে এই কথাই প্রচার ক'রতে চেয়েছেন যে সতীত্ব কেবলমাত্র নারীর সামাজিক আচার নয়। কোন বিশেষ অবস্থার নারীই যে একমাত্র ওটা দাবী করতে পারে এ ধারণাও ভুল। নিষ্ঠাই নারীর ধর্ম্ম এবং এই নিষ্ঠা বিবাহের বাহিরেও নারীর মধ্যে বর্ত্তমান। একই নীতির কষ্টিপাথরে সকলের সততা সম্বন্ধে বিচার চলে না।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির মোট কথা হ'চ্ছে,—এই সংসারে কোন

মানুষই ছোট নয়। সুযোগ এবং সুবিধা পেলে সকলেই মহৎ হ'তে পারে। দেহের চেয়ে প্রেম বড় এবং সমাজে সকল সম্বন্ধের চেয়ে বড়—কল্যাণের সম্বন্ধ। এই কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই রমা-রমেশ, সতীশ-সাবিত্রী এবং শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর মত বড় গভীর প্রেমেরও চোখের জলে পরিসমাপ্তি হ'ল। শরৎচন্দ্র সমাজের বিধি নিষেধকে প্রতি পদে মেনে নিয়েছেন ব'লে অনেকে তাঁকে দুর্ব্বল ব'লে উপহাস ক'রেছেন কিন্তু সে উপহাসকে অবজ্ঞা ক'রে তিনি যে কতো বড় শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন তা artist মাত্রেই বুঝবেন। অভিনয় শেষে রমা-রমেশ বা সতীশ-সাবিত্রীর সামাজিক মিলন ঘটলে আমরা হাসি মুখেই বাড়ী ফিরতাম বটে কিন্তু শরৎচন্দ্রের বইগুলি তাহোতে cheap romanceএ পর্য্যবসিত হতো মাত্র। বাস্তব সত্যকে বাদ দিয়ে কখনো কোন বড় সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে পারে না। আমাদের সমাজে কমেডি যে খুবই কম সে কথা নেহাৎ মিথ্যা নয়।

শরৎচন্দ্রের বইগুলির শেষে ট্রাজেডি আছে ব'লেই প্রচার হিসেবে তাদের মর্য্যাদা বেড়েছে। রমা-রমেশের জীবনের ব্যর্থতাটাকেই বড় ক'রে এঁকে শরৎচন্দ্র তাঁদের দুঃখে আমাদের চিত্ত বেদনায় কাতর ক'রে তুলেছেন। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জাগিয়েছেন। সেই-খানেই তাঁর প্রচারের সার্থকতা। রসশিল্পী শরৎচন্দ্রের মত নিপুণ প্রচারক সাহিত্য-জগতে খুব কমই আছেন।

শরৎসাহিতে যাঁরা শুধু গল্পই খুঁজবেন তাঁরা ঠকবেন। এখানে এসে মাথা ঘামাতে হবে, কিছু শিখতে হবে, শুধু রূপকথা শুনলে চলবে না। আজকাল সাহিত্যের বাজারে একটা অতি-পরিচিত

ইংরেজী বুকনি যেখানে সেখানে অত্যাচার ক'রতে সুরু ক'রেছে। সেটি হচ্ছে—art for art's sake। এ বিলিতি বুলিটি কপচানো যেন এদেশের সমালোচকদের একটা মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। Art মানে এখানে যদি শুধু গল্পই হয়, তা হ'লে art for art's sake শরৎ-সাহিত্যে অচল। ছেলেবেলায় ঠাকুমার ঝুলিতে art for art's sake দেখেছি অর্থাৎ অমন 'নির্জ্জলা গল্প আর কোথাও পাইনি। শরৎসাহিত্যে তিনি গল্প লেখেন দেখ্‌লাম art for life's sake—অর্থাৎ শরৎচন্দ্র শুধু গল্পের জন্য গল্প লেখেন না মানুষকে তৈরী করবার জন্যে, জীবনকে বৃহত্তর, দৃঢ়তর, গভীরতর করে গড়ে তোলবার জন্যে। জাতির যাবতীয় শৃঙ্খল মোচনের জন্যে।

শরৎচন্দ্র আমাদের ভাবিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন। আমাদের বারে বারে আঘাত ক'রতেও ছাড়েন নি কিন্তু সে আঘাত আমাদের নিস্তেজ না ক'রে নব নব কর্ম্ম প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ ক'রেছে। আমাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জাগিয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাধনা অপার, তাঁর বেদনা অপার। তাঁকে তাই সাধক বা প্রচারক ব'ললে ভুল হয় না। শরৎচন্দ্রের কাছে আমরা সংসারকে চিনেছি, সমাজকে চিনেছি—নিজেকে চিনেছি। তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টি মানবের কল্যাণে একটি অনবদ্য প্রচারের অপূর্ব্ব ইতিহাস।

তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

দরদীয়া

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী

দেখবো তোমায় দেখবো শুধুই একটি নিমেষ তরে !
অনেক দিনের ব্যাকুল আশা গুম্‌রে আজো মরে
আমার মনের গোপনকোণে। প্রাণের পরম লোকে
বন্দি' তোমায় বন্ধু নারীর ! রূপ না দেখেও চোখে।
সুদূর হতেও তোমায় চিনি তুমিই নিকটতম !
সকল নারীর স্বরূপ যে গো আয়না-ছায়ার সম
দরদ-গভীর তোমার চিতে কাঁপায় প্রতিচ্ছবি ;
মৌন মোদের মর্ম্মব্যথা তোমার জানা সবি।
আঁকলে তুমি কোন্ বেদনায় ঝুরছে নারীর প্রাণ
কোন্ খানে তার দুর্ব্বলতা উগ্র কোথায় মান !
হৃদয়-বীণার কোন্ তারে সে সইতে নারে ছোঁয়া,—
চরিত্র তার স্বচ্ছ কোথা, কোথায় শুধুই ধোঁয়া।
কোথায় আঘাত বাজ্‌লে নারী সকল বিচার ভুলে
আপন হাতেই অমঙ্গলের চরম গরল গুলে
ছড়ায় সকল সংসারে তার, করতে পারেও পান,
সর্ব্বনাশের অগ্নিদাহে পুড়িয়ে আপন প্রাণ।
আবর্জ্জনায় বিবর্জ্জিত মহৎ হৃদয় কতো
পাপ অশুচির পঙ্ক ভেদি' পঙ্কজেরই মতো

উঠছে ফুটে এই সমাজের চোখের অন্তরালে,
জানতো না কেউ প্রেমের প্রদীপ এদের বুকেও জ্বালে
তিমির হরণ ত্যাগের আলো।—প্রিয়ের শুভ লাগি
জীবনব্যাপী দুখের রতি একলা কাটায় জাগি'।
গহন মনের সন্ধানি গো! আজকে তোমায় ক'ব,—
নারীর হৃদয়-রহস্য কী,—ধ্যানের দিঠি তব
অন্ধকারেও ঠিক্ দেখেছে বজ্র আলোর ফুল!
তোমার দেখায় তোমার জানায় হয়নি কোথাও ভুল।
অন্তরেরি অন্তরালের অন্তরঙ্গ প্রিয়,—
আমরা তোমায় তাই মেনেছি একান্ত আত্মীয়।

মুক্তির পুরোহিত

শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায়

আমাদের বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাতুর বীণায় চূড়ান্ত স্বরটি বাজিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বাংলার বুকে হঠাৎ অযাচিত পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের মত এলেন শরৎচন্দ্র। কি তার স্নিগ্ধ শীতল অমল ধবল মাধবী জ্যোৎস্নায় মাঠ ঘাট ভরানো প্লাবন! রসলিপ্সু বাঙালীর সব অন্তর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সমস্বরে গেয়ে উঠ্‌লো—

আমার নিতি সুখ ফিরে এসো—
আমার চির দুখ ফিরে এসো—
আমর সব সুখ দুখ মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এসো!

সত্যিই, "ফিরে এসো" ছাড়া এই চিরপরিচিত বড় আপনার জনকে আর কি বলা যেতে পারে? বাঙালীর দুঃখ-দৈন্তের আবর্জ্জনায় ভরা জীর্ণ শ্রীহীন পর্ণকুটিরটির করুণ সুষমা আর এমন ক'রে কে দেখিয়েছে? সেই হেনার গন্ধে আকুল নিকানো দাওয়াটিতে পল্লী-লক্ষ্মীর এত রূপ এমন প্রাণকাড়া শ্রী আর কোন্ সহজ শিল্পী এমন মর্ম্মস্পর্শী ক'রে ফুটিয়েছে?

আমাদের এতদিন ধারণা ছিল মানুষকে ধোপদস্ত জেণ্টল্‌ম্যান সাজাতে হবে, ক্রটী বিচ্যুতি, দুঃখ বেদনা তার জীবনের বিকৃতি —পাপের বোঝা; প্রকৃত মানুষ হ'চ্ছে সেই, যে এই সব অখাদ্য ছেড়ে

শাস্ত্রকারের দেওয়া জাব্‌নায় পরম নিশ্চিন্ত মনে খোলবিচিলি পচা ফ্যানের সঙ্গে হাপুস্‌ হুপুস্‌ করে খায়। অতবড় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক নায়িকারও কি আপ্রাণ চেষ্টা জীবনের পঙ্কিল ভরা গঙ্গা পেরিয়ে সদ্‌গুণের বাঁধানো ঘাটে ওঠার। তবু তিনি জীবনের চিত্রকর ব'লে নিজের অজ্ঞাতে সূর্য্যমুখী ও কুন্দ-নন্দিনীর অরূপ সুষমা না ফুটিয়ে পারেন নি, কিন্তু তবু তার জন্যে দু'বেচারীকেই কি নাজেহালটাই না ক'রেছেন। আর রোহিণী পাপিয়সীর কথা না বলাই ভাল!

মানুষের দুঃখে যে এত মধু আছে, তার পাপের যে এমন অবনী-বহা লাবনী থাকতে পারে, তার ষড়রিপু যে আসলে ছদ্মবেশে তার ছয়টি শ্রীদাম সুদাম তুল্য সখা, একথা এমন দরদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের আগে আর কে ব'লেছে? পরম রসের ঋষি একদিন রস স্বরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন উপরের কোন্‌ পরা জগতের পথে উঠতে গিয়ে, যে রস পেলে সব আনন্দময় হ'য়ে যায়। মানব জীবনের এ ঋষিও সেই রসেরই সন্ধানী। মানুষের ভয় ভক্তির স্বর্গ নরক একাকার করে এত আনন্দ এত রসপ্লাবন আর কে আনতে পেরেছে এ ত্রিতাপদগ্ধ দুনিয়াতে।

এই হ'চ্ছে প্রকৃত স্রষ্টার লক্ষণ—সে সব কিছু দুঃখ বেদনা গ্লানির মাঝে চিরন্তন আনন্দঘনকে, চির সুন্দরকে ছদ্মবেশ খুলে দেখিয়ে দেয়। তখন মানুষের ভয় থেকে আসে মুক্তি, সংস্কারের খোঁটা আর দড়ি যায় ঘুচে, মানুষ পায় দিগন্তের সুনীল স্বচ্ছতার মাঝে ছাড়া। শরৎচন্দ্রের উদয়ে শুধু বাঙলা সাহিত্যেই নয়; সমাজ জীবনেও এসেছে এই পরম

স্বস্তি ও আনন্দ। তাই তা'র দেখানো পথটি চেয়ে ভিড় ক'রে কথা-সাহিত্যের অনবদ্য স্রষ্টাও এসেছে কত, মায়ের কমলবনে লেগে গেছে মধুকরের বিপুল মহোৎসব।

মানুষ যত দীন হয় তত তার লোভ ও স্বার্থপরতা বেড়ে চলে চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে। তখন সে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে লোহার সিন্দুকে ভ'রে ছাতা ধরায়, রূপ ও যৌবনকে গৃধ্নু কৃপণের দুরন্ত তাড়নায় পাঁচিলের পর পাঁচিল তুলে যক্ষ্মায় রুগ্ন ক'রে তোলে। সমাজ ও ধর্মের বাণ্ডিল রচনা ক'রে দীন লোভী চায় দেবলোককে তারই ভোগের জন্য পাষাণ চাপা দিয়ে রাখবে। সেই শত প্রাকার বেষ্টিত অন্ধকার রুদ্ধ সেঁৎসেঁতে সমাজ থেকে ভগবানের মুক্ত সহজ আলো বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার সৃষ্টিও বিদায় নেয়। আনন্দ যার প্রেরণার বীণা, মুক্তি যার আসনপদ্ম, সেই সরস্বতী কংসের কারাগারে তাঁর কমলবন রচণা ক'রবেন এটা দুরাশা ছাড়া আর কি? তাই যখন কোন দেশে রুদ্রের উদ্দাম নৃত্যের তালে তালে পুরাতন রাষ্ট্র বা ধর্মের জীর্ণ প্রাসাদ পড়ে যায় তখন সেই ধ্বংসের জীর্ণ স্তূপ থেকে বেজে ওঠে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীতে বাগ্দেবীর বীণা যন্ত্রটি, আর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেয় নূতন সাহিত্য, নবতর কলা, নূতন চিত্রী ও ভাস্কর, অভিনব বীর ও কর্ম্মী, নবীন যা-কিছু সবই।

শরৎচন্দ্র ও এসেছেন আমাদের মরা-গাঙে ঘোলা বাণের সঙ্গে তাঁর ধবল শঙ্খটির নিঃস্বনে—সে প্লাবনকে আরও দুকূল ভাঙা ক'রে, আরো উর্ম্মিল ও ক্ষুব্ধ ক'রে—তিনি মুক্তির যুগেরই আর এক নব ভগীরথ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের জন্য বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্য কতখানি প্রস্তুত ছিল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেমন স্বাভাবিক তাহার উত্তর দেওয়াও সেইরূপ দুরূহ। তিনি বাঙ্গালার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে সমস্ত উপাদানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস সাহিত্যে তাঁহার এই বিশেষত্বগুলির কতকটা পূর্ব্বসূচনা পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা তাঁহার অনন্য-সুলভ মৌলিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিষিদ্ধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণ, আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলির তীক্ষ্ণ তীব্র সমালোচনায়, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্ব্বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালীর মনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বহুদূর ছাড়াইয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্য যে স্রোতোহীন শুষ্কপ্রায় খাতের মধ্য দিয়া অলস মন্থরগতিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিতেছিল, তিনি সেখানে বহিঃ-সমুদ্রের স্রোত বহাইয়া তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছেন, নূতন ভাবের উত্তেজনায় তাহার মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার

করিয়াছেন। এইদিক দিয়া দেখিতে গেলে পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস সাহিত্যের সহিত তাঁহার যোগ অতি সামান্য। কিন্তু ইহাই তাঁহার উপন্যাসের একমাত্র বিষয় নয়। তাঁহার উপন্যাসের আর একটী দিক আছে যেখানে তিনি পুরাতন ধারাই অব্যাহত রাখিয়াছেন, যেখানে পুরাতন সুরেরই প্রাধান্য। তাঁহার অনেক উপন্যাসে আধুনিক প্রেম-সমস্যার আদৌ ছায়াপাত হয় নাই, কেবলমাত্র আমাদের পারিবারিক জীবনের চিরন্তন ঘাত প্রতিঘাতই আলোচিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের ব্যাপক আলোচনা করিতে গেলে, তাঁহার এই নূতন ও পুরাতন উভয় ধারাই লক্ষ্য করিতে হইবে। তাঁহার মৌলিকতা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা উপন্যাসের বিকাশ-ধারার বহির্ভূত নহেন।

'চরিত্রহীন' 'শ্রীকান্ত' ও 'গৃহদাহ' ছাড়া বাকী উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র পুরাতন ধারারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। 'কাশীনাথ' 'দেবদাস' 'চন্দ্রনাথ' 'পরিণীতা', 'বড়দিদি', 'মেজদিদি' 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজবৌ', 'স্বামী', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি সমস্ত গল্পগুলিই বাঙ্গালী পরিবারের ক্ষুদ্র বিরোধ ও ঘাত প্রতিঘাতেরই কাহিনী। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে প্রেম-বর্জ্জিত—একান্নবর্ত্তী গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে প্রেমের যে স্বল্প অবসর ও অপ্রধান অংশ তাহাই ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। আর কতকগুলিতে যে প্রেমের চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সাধারণ ও সামাজিক বিধিনিষেধের অনুবর্ত্তী। প্রেমের যে দুর্দ্দমনীয় প্রভাব, সমাজ-বিধ্বংসী শক্তির মূর্ত্তি শরৎচন্দ্রের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দর্শন ইহাদের মধ্যে

মিলে না। এইগুলির জন্যই শরৎচন্দ্র উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্ব্ব ইতিহাসের সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়াছেন।

এই সমস্ত গল্পগুলির কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। প্রথমতঃ তাহারা সকলেই ক্ষুদ্রাবয়ব, ছোট গল্পের অপেক্ষা আয়তন বেশী নয়। অথচ ইহারা ঠিক ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্তও নয়। ছোট গল্পের পরিসমাপ্তির মধ্যে যে একটা সাঙ্কেতিকতা, একটা অতর্কিত ভাব থাকে, তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যে সমস্যার অবতারণা হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা ও মীমাংসা সম্পূর্ণ ও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ইহাই আমরা উপলব্ধি করি। বাঙ্গালা-সাহিত্যের উপন্যাসের আয়তন সাধারণতঃ কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোনও আদর্শ নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে ইউরোপীয় তিন ভলুমে সম্পূর্ণ উপন্যাসের বিস্তার যে এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবসর নাই। আমাদের সাধারণ পরিবারিক জীবনে যে সমস্ত বিরোধ সংঘাত জাগিয়া উঠে তাহাদের গ্রন্থি বিশেষ জটিল ও দীর্ঘ নহে। সুতরাং তাহাদের আলোচনার ক্ষেত্রও অতিবিস্তৃত হইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার অভ্যস্ত সংযম ও ও সহজ কলানৈপুণ্যের সহিত তাঁহার উপন্যাসগুলির যে সীমানির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাই বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের স্বাভাবিক আয়তন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই গল্পগুলিতে পারিবারিক বিরোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে মেলে। আমাদের পারিবারিক জীবনে স্নেহ প্রেম ঈর্ষ্যা প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি সাধারণতঃ যে খাতে

প্রবাহিত হয়—তাহার ব্যতিক্রম দেখানোতেই ইহাদের বৈচিত্র্য। যে বিভিন্ন উপাদান লইয়া আমাদের পারিবারিক ঐক্য গঠিত হয়, ... পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ-সংঘাত একান্নবর্ত্তী পরিবারের ছায়াতলে একটা ক্ষণস্থায়ী মিলনে বাঁধা পড়ে, তাহাদের মধ্যে একটা চিরপ্রথাগত সন্ধি-বিগ্রহের, ভেদ-মিলনের সূত্র ঠিক হইয়াই থাকে। দৈনিক জীবন-যাত্রার মধ্যে যখনই সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে, যখনই ভাঙ্গন সুরু হয়, তখন এই পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ভেদ-রেখা ধরিয়াই ফাটল দৃষ্টিগোচর হয়। যখনই এই পরিবারিক কলহ আত্মপ্রকাশ করে, তখনই আমরা বিচ্ছেদ-রেখার গতিটা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিতে পারি—বুঝিতে পারি যে কে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে। কিন্তু সময় সময় মানুষের স্বাধীন প্রকৃতি এই সমাজ রচিত বাঁধা রাস্তায় চলিতে চাহে না। এই সনাতন শ্রেণী বিভাগের সরল রেখা অতিক্রম করিয়া একটা বক্র, তির্য্যক্ গতি অবলম্বন করে। তখনই পারিবারিক বিরোধটী নূতন রকমের জটিলতা ও বৈচিত্র্য লাভ করে। আবার পারিবারিক জীবনে এমন লোকও থাকে, যাহারা এই দ্বিধা-বিভক্ত পরিবারের প্রান্ত সীমায় দাঁড়াইয়া একটা ব্যাকুল অনিশ্চয়ের সহিত উভয় দিকেই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করিতে থাকে। যাহারা রক্ত-সম্পর্ক ও স্নেহের দাবী এই উভয় বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে অক্ষম হইয়া একটা উৎকট, বিসদৃশ অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। পারিবারিক জীবনে স্নেহ-প্রেমের বক্রগতির চিত্র রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা', 'ব্যবধান', 'রাসমণির ছেলে' প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট-গল্পে পাওয়া যায়। সুতরাং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রণালী রবীন্দ্রনাথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বিরোধের একটা সাধারণ প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহাকে কাব্য-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তোলেন—তাঁহার গল্পগুলিতে তথ্য-সন্নিবেশ অপেক্ষাকৃত বিরল, বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব ও কল্পনা-সমৃদ্ধি উভয় দিক দিয়াই মনোজ্ঞ ও রমণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটী আরও তীক্ষ্ণ, আরও অসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে; কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের অন্তরালে চাপা পড়ে না। ভাব প্রকাশের গভীরতাতেও তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব—তাঁহার গল্পগুলিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সংঘাতগুলি অন্তর্বিপ্লবের বিদ্যুৎ-চমকে দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি কোথাও কেবল ঘটনা-বৈচিত্র্য বা কাব্য-সৌন্দর্য্যের জন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করেন না—প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোক পাত করে।

শরৎচন্দ্রের পারিবারিক বিরোধ-চিত্রগুলির মধ্যে আর একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত পূর্ব্বতন ঔপন্যাসিক ভ্রাতৃবিরোধ বা সংসার-বিচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই সমস্ত দোষ এক পক্ষের উপর চাপাইয়া নীতি এবং কলাকৌশল উভয় দিক হইতেই একদেশ দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। যেখানে এক পক্ষ প্রবল অত্যাচারী ও অন্য পক্ষ নিরীহ ও অসহায়, বিনা প্রতিবাদে অপর পক্ষের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, সেখানে একপ্রকার সুলভ করুণ রস উদ্বেলিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু বিরোধের তীব্রতা ও জটিলতা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। 'স্বর্ণলতায়' ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটী আলোচনা করিলে পাঠকের সহানুভূতি এক মুহূর্ত্তের জন্যও

দ্বিধাগ্রস্ত বা অনিশ্চয়িত থাকে না—প্রমদা ও সরলার মধ্যে পক্ষাবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র সংশয় বা বিলম্ব হয় না। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ কিছু গভীরতা থাকে না—কলাকৌশলের দিক দিয়া এ সমস্ত চিত্র প্রায়ই অক্ষম ও ব্যর্থ হইয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের সমস্যাগুলি এত সহজ ও প্রাথমিক রকমের নহে—তাঁহার মনুষ্য চরিত্রের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে শিখাইয়াছে যে এরূপ দায়িত্ববিভাগ ঠিক প্রকৃতির অনুগামী নহে। ন্যায় ও ধর্ম্ম যে পক্ষে, যাহার হৃদয় সরল ও অবিকৃত, তাহার মধ্যে একটা বাহ্য কর্কশতা বা তীব্র অসহিষ্ণুতা আরোপ করিয়া তিনি বিরোধটীকে জটিলতর করিয়া তোলেন।

এই বিশেষত্বের উদাহরণ শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত গল্পেই মেলে। 'বিন্দুর ছেলেতে' অমূল্যধনের প্রতি বিন্দুর তীব্র, উৎকট স্নেহ পারিবারিক জীবনের সাধারণ মাত্রাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায়। তাহার দারুণ অভিমান, পরমত অসহিষ্ণুতা ও ধনগর্ব্ব তাহার অনুক্ষণ সন্দেহ-পরায়ণ অতি সতর্ক অপরিমিত স্নেহের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত, তাহার চরিত্রটিতে দোষে গুণে এমন মাখামাখি হইয়াছে যে তাহার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ খুব সহজ নহে। ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ যে পারিবারিক শান্তিভঙ্গের একমাত্র কারণ তাহা নয়; অনেক সময় স্নেহের আতিশয্য বা বিভাগ-বৈষম্য যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে তাহা আরও মর্ম্মান্তিক। এখানে বাহির হইতে যে বিরোধের কারণটী আসিয়াছে—এলোকেশী ও নরেনের আবির্ভাব —তাহার প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই, এবং গল্পের সহিত তাহাদের যোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ নহে।

'রামের সুমতি'তে একই সমস্তার একটা বিভিন্ন দিক দেখান হইয়াছে। এখানে বিরোধের মূল কারণ নারায়ণীর স্নেহাতিশয্য নহে; একদিকে রামের উৎকট দুরন্তপণা, অপর দিকে নারায়ণীর মাতার ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ, জটিলতার সূত্রে পাক দিয়াছে। দুরন্ত রামের মধ্যে যে স্নেহশীল হৃদয় আছে তাহা কেবল নারায়ণীর স্নেহের স্পর্শে জাগিয়া উঠে—যাহার স্নেহ নাই সে এই গোপন মাধুর্য্যের সন্ধান পায় না। নারায়ণীর মাতা কেবল তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে এবং নিজ ঈর্ষ্যা-দগ্ধ স্পর্শের দ্বারা তাহার দুরন্তপণাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে।

'মেজদিদি' গল্পে বড়বধূর ভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন কৃষ্ণর প্রতি মেজবধূ হেমাঙ্গিনীর সহানুভূতিমিশ্র ভালবাসাই মুখ্য বিষয়। নিজের দিদি অপেক্ষা এই নিঃসম্পর্কীয়া দিদির বেশী ভালবাসাই তাহাদের সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণর প্রতি হেমাঙ্গিনীর এই অহেতুক ভালবাসা চারিদিক হইতে বাধাপ্রাপ্ত ও প্রতিহত হইয়া বেশ স্বাভাবিক অক্ষুণ্ন গতিতে প্রবাহিত হইতে পায় নাই। এই রুদ্ধমুখ স্নেহ কখনও বা কৃষ্ণর প্রতি তীব্র বিরক্তির আকারে কখনও বা তাহার স্বামী বিপিনের বিরুদ্ধে একটা মর্ম্মান্তিক অভিমানের রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত না পরিবারের মধ্যে ইহা একটা স্বাভাবিক, চিরস্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, সে পর্য্যন্ত ইহার অশান্ত বিক্ষোভ শান্তি লাভ করিতে পারে নাই।

'মামলার ফল' গল্পটীতেও স্নেহের এই তির্য্যক গতির একটী নূতন রকমের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ভ্রাতৃবিরোধে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন

পরিবারের মধ্যে ছোট ভায়ের ছেলে, কিন্তু বড় ভাইএর স্ত্রীর দ্বারা লালিত পালিত গয়ারাম একটা অভগ্ন সংযোগ সেতু রহিয়া গিয়াছে।

'একাদশী বৈরাগী'তে মানব-মনের একটী বিস্ময়কর অসঙ্গতির চিত্র দেখান হইয়াছে। একাদশী একেবারে চক্ষুলজ্জাহীন সুদখোর —প্রসন্নমনে একটা পয়সা সুদ ছাড়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব। চারি আনা চাঁদা দেওয়া তাহার পক্ষে দানশীলতার চরম সীমা। কিন্তু এই পাষাণের মধ্যেও দুইটী শীতল নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে—এক তাহার পদস্খলিত ভগিনীর প্রতি একান্ত অনুযোগহীন স্নেহ, আর একটী তাহার গচ্ছিত অর্থ সম্বন্ধে অবিচলিত ন্যায় নিষ্ঠা ও ধর্ম্মজ্ঞান। যাহার মন একদিকে এত নীচ, অন্যদিকে তাহা প্রায় মহত্বের শিখর স্পর্শ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে নীচের মধ্যে মহত্বের বীজ কখনও তাঁহার চক্ষু এড়ায় না।

'নিষ্কৃতি' গল্পে ভ্রাতৃবিরোধের চিত্রটী বেশ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। এখানে যদিও হরিশ ও তাহার স্ত্রী নয়নতারার কুটিলতাই বিরোধের প্রধান কারণ, তথাপি সিদ্ধেশ্বরীর তোষামোদ-প্রিয়তা ও অস্থির মতিত্ব এবং শৈলর অনমনীয় তেজস্বিতা ও মতদার্ঢ্যও সংঘর্ষের তীব্রতা বাড়াইয়া দিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে পাঁচজনকে লইয়া চলিতে হইলে যতটা কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও আত্মসঙ্কোচের প্রয়োজন, শৈলর মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। তাহার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা ও অকুণ্ঠিত স্পষ্টবাদিতা কোনরূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিতে নারাজ, সুতরাং সংসারের রাখা-ঢাকা, ভাগ-বণ্টনের কাজে ইহা একেবারেই অনুপযুক্ত।

আবার সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহদুর্ব্বল হৃদয়টীও সর্ব্বদাই দ্বিধা-সন্দেহে দোলায়িত ; শৈলর প্রকৃত মনোভাব যে তিনি না বুঝেন তাহা নহে ; তথাপি তাহার নিকট নীরব, অক্লান্ত সেবার অতিরিক্ত একটাও মনরাখা কথা না পাইয়া তাঁহার মন মাঝে মাঝে বিরূপ হইয়া বসে ও নয়নতারার চক্রান্ত বুঝিলেও অনিচ্ছায় তাহার পোষকতা করে। আবার অতুলচন্দ্রের বয়কটের কথা স্মরণ করিলে নয়নতারার স্বপক্ষেও যে কিছু বলিবার আছে তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করি। সকলের সহযোগিতাই এই পারিবারিক বিরোধের চিত্রটীকে বেশ জটিল ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে—দোষ কেবল একপক্ষের হইলে সংঘর্ষের তীব্রতা এত ঘনীভূত হইতে পারিত না।

'বৈকুণ্ঠের উইলে' ভ্রাতৃবিরোধের একটা অনন্য সাধারণ দিক দেখান হইয়াছে। তাহার বি ত্র অনার পাশ ভাই বিনোদের প্রতি গোকুলের মনোভাব ঠিক সাধারণ অগ্রজের মত নহে—তাহার স্নেহের সহিত একটা সশঙ্ক সশ্রদ্ধ কুণ্ঠার ভাব জড়াইয়া আছে। তাহার অশিক্ষিত, অসভ্যোচিত, বাহ্যতঃ কর্কশ ভাবের অন্তরালে যে মাধুর্য্য ও কোমল স্নেহশীলতা প্রবাহিত হইতেছে তাহার মৌলিকতা উপভোগ্য। বৈকুণ্ঠের উইলে গোকুলের চরিত্রে লেখক তাহার সহজ ও বাহ্য ইতরতা কোন আদর্শবাদের দ্বারা রূপান্তরিত করেন নাই। তবে গোকুলের বাক্য ও ব্যবহার অসংযম ও অস্থির মতিত্ব যেন চরম মাত্রায় উঠিয়াছে—এইরূপ প্রকৃতির লোকের পক্ষে ব্যবসায় বা পরিবারের কর্ত্তৃত্ব এই দুইই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহার ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী ও পিতার

অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে তাহার পরবর্ত্তী খামখেয়ালী ব্যবহারের যেন একটা অসঙ্গতি থাকিয়াই যায়।

'পণ্ডিত মহাশয়' গল্পে বৃন্দাবন ও কুসুমের পরস্পর ব্যবহারের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত, তাহাদের পুনর্ম্মিলনের পথে নূতন নূতন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি লেখকের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কুসুমের পক্ষে প্রধান বাধা বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে ভদ্র, উচ্চবর্ণোচিত প্রবল সংস্কার—বৃন্দাবনের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা কুসুম কর্ত্তৃক তাহার মাতার অপমান। বিবাহের পরে ধনী শ্বশুর-বাড়ীর প্রভাবে কুঞ্জনাথের অতর্কিত আমূল পরিবর্ত্তন অথচ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার লুপ্তপ্রায় ভগিনীস্নেহের ধ্বংসাবশেষের গোপন সংরক্ষণ—বেশ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। শেষের দৃশ্যগুলিতে বৃন্দাবনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটীও বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শের ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া গিয়াছে।

এই শ্রেণীর বাকী গল্পগুলির মধ্যে প্রেমের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে। এই প্রেম ঠিক নিষিদ্ধ নহে ও সামাজিক বিধি নিষেধকে একেবারে তুচ্ছ করে নাই; এবং 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর উপন্যাসের ন্যায় এগুলিতে প্রেমের ঘাত প্রতিঘাতের খুব দীর্ঘ ও নিপুণ বিশ্লেষণও নাই। তথাপি পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলির পূর্ব্বসূচনা কতকটা ইহাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রেম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হইলেও, সামাজিক অনুমোদনের ছাপ মারা না থাকিলেও চিরাভ্যস্ত সংস্কারের খোলস-বর্জ্জিত হইলেও প্রেমের যে একটা নৈসর্গিক মহত্ত্ব, একটা বিপুল আত্মলোপী আবেগ আছে সে

বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসেও বেশ সচেতন আছেন। এই ধিক্কৃত অবমানিত প্রেম চিরকালই তাঁহার গভীর সহানুভূতি পাইয়া আসিয়াছে। ইহার প্রথম আবির্ভাব ও ক্রমপরিণতি, ইহার উচ্ছ্বসিত আবেগ ও বিপুল আত্মোৎসর্গ, ইহার অদম্য স্বাধীনতা ও সমাজের অন্যায় প্রতিষেধের বিরুদ্ধে নির্ভীক বিদ্রোহ, সর্ব্বোপরি ইহার ব্যাকুল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা-সন্দেহ-জড়িত আত্মোপলব্ধি তিনি প্রত্যক্ষ গভীর অনুভূতির সহিত ও অভ্রান্ত নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে চিত্রিত করিয়াছেন—এবং বঙ্গের উপন্যাস সাহিত্যে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

শরৎচন্দ্র বন্দনা

শ্রীনিরুপমা দেবী

পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় নির্ঝর যেমন তাহার জীবনের কিছুদিন কাটাইয়া সহসা একদিন প্রবলবেগে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং নিজের প্রচুর জীবন ধারায় তাহার দেশ গ্রাম অভিষিক্ত করিতে করিতে চলিতে থাকে, তেমনি পশ্চিমের এক সামান্য গৃহকোণে যে অদ্ভুত রচনাশক্তি ক্রম-পরিণতি লাভ করিয়া আজ বাংলাসাহিত্য ভূমিকে তাহার অপূর্ব্ব রসধারায় অভিসিঞ্চিত ও প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই অদ্ভুত শক্তি ও শক্তিমানের কথা ভাবিতে আজ আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। একদিন যে সুধা-নিস্যন্দিনী নির্ঝরিণীর স্নেহধারা "অভিমান, 'বালা' 'শিশু" 'কোরেলগ্রাম' 'বোঝা' 'কাশীনাথ' 'চন্দ্রনাথ' 'দেবদাস' 'বড়দিদি' প্রভৃতি রূপে সেই গুহাতলে বহিয়া সেই অখ্যাত দিনের স্নেহ-সঙ্গী গুলিকে মন্ত্রমুগ্ধ করিত, আজ সেই নির্ঝর তাঁহার বিপুল বিস্তৃত স্রোতে বঙ্গ-সাহিত্য ভূমির বক্ষে "শ্রীকান্ত, 'পথের দাবী' 'দত্তা' 'ষোড়শী', 'পল্লী-সমাজ' 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্র তরঙ্গ-মালার বিচিত্র শোভা দান করিতেছে, ইহা মনে করিতেও কি সে দিনের সেই সঙ্গীগুলি হর্ষ গর্ব্ব পূর্ণ এক বিচিত্র অনুভবে অনুভাবিত না হইয়া থাকিতে পারে? আজ সেই শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে দেশের সাহিত্যসূর্য্য হইতে সকল সাহিত্যসাধক সাহিত্যরসিক সানন্দে

সম্মিলিত! এখানে আজ তাহাদের বলিবার বেশী কিছু তো থাকিতে পারে না; তাহাদের কেবল দেখিবার কথা, অনুভব করিবার কথা!

নিজের প্রথম জীবনের তুচ্ছ সাহিত্য সেবায় একদিন যে পরোক্ষ-ভাবে দূর হইতে এই শরৎচন্দ্রের রচনালোকে পথ দেখিবার সাহায্য পাইয়াছিল, শরৎচন্দ্রের সেদিনের সেই পরোক্ষ পরিচিতা ভগ্নী-স্থানীয়া আজও সকলের অন্তরাল হইতেই তাঁহাকে সানন্দ বন্দনা জানাইতেছে মাত্র। তারও প্রার্থনা আজিকার এই আনন্দ-সম্মিলন পূর্ণতম হউক; এই শরতে শরৎচন্দ্র-জন্ম-উৎসব-পার্ব্বণে তাঁহার রচনা-কিরণ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া বঙ্গ কথা-সাহিত্যের শোভা দিনে দিনে বৃদ্ধি করুক।

শরৎচন্দ্র

সুশীলচন্দ্র মিত্র

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হ'য়েছে খুবই সম্প্রতি, যদিও সাহিত্যিকের যে পরিচয়, তাঁর সঙ্গে আমার সে পরিচয় ছিল সেই 'যমুনার' যুগ থেকে। আমাদেরই চোখের সাম্‌নে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কেমন সহজভাবে বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র তাঁর আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন,—তা' বেশ মনে পড়ে। তাই ব্যক্তিগত পরিচয় না থাক্‌লেও শরৎচন্দ্রকে চিন্‌তাম না, একথা বল্‌লে কবুল করতে হয় বাঙলা সাহিত্যের কোনো খবরই রাখ্‌তাম না। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে এ দুর্গতি থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম; আমরা যখন কলেজে প্রবেশ করি, তার আগেই তিনি শিক্ষিত সমাজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে জাতে তুলেছিলেন। যেদিন 'যমুনা' পত্রিকায় 'বিন্দুর ছেলে' পড়ে মুগ্ধ হ'য়েছিলাম, সেদিনের কথা আজও বেশ মনে পড়ে। স্মৃতির পটে সে পুলকের রঙ হয়ত এখন অনেকখানি মুছে গেছে, তার গভীরতাও হয়ত অনেকটা কমে গেছে,—কিন্তু আজ শরৎচন্দ্রের জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষ্যে কিছু শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করবার অনুরোধ পেয়ে সেদিনের কথা স্মরণ করে মনের মধ্যে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। হাতের কাছে একখানা 'বিন্দুর ছেলে' নেই; থাক্‌লে হয়ত একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তাম সেদিনকার সেই অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে আবার কতটা পরিমাণে

জাগিয়ে তুল্‌তে পারা যায়। সে পুলকটা আর ফিরে পেতাম কিনা জানি না, কিন্তু না-পেলেও সেটা শরৎচন্দ্রের দোষ নয়, আমারই মনের দোষ। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-কৌশল সম্বন্ধে এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে 'বিন্দু'র সঙ্গে আমার দেখা নেই আজ বিশ বছর, কিন্তু তাকে আজও ভুলি নি; অতি-পরিচিতের মতই সে স্মৃতির মধ্যে চিরকালের জন্য বাসা বেঁধে আছে।

শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বা গভীরভাবে এ প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করবার আমার ইচ্ছা নেই; আর ইচ্ছা থাকৃলেও তার উপায় ছিল না। কারণ, শরৎ-ভক্তদের কৃপায় আপাততঃ আমার বই-এর আল্‌মারির মধ্যে শরৎচন্দ্রের বই একখানিও খুঁজে পাচ্চি না, যদিও তাঁর যতগুলি বই পড়েছি, তার অধিকাংশই কিনে পড়েছি, একথা বেশ মনে পড়ে। আজ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে বসে আমার এই অভিজ্ঞতাটুকু হোল যে এতবড় জনপ্রিয় লেখকের বই কিনে লাইব্রেরি সাজানো আমার মত দরিদ্র লোকের সাধ্যের বাইরে। কেননা প্রত্যেকটি বই-এর দশখানি করে কিন্‌লে যদি সৌভাগ্যক্রমে তার মধ্যে একখানি আল্‌মারিতে থেকে যায়! খবরের কাগজে মাঝে মাঝে বিলেতি লেখকদের আয়ের কথা পড়ে অবাক হই,—যেন রূপকথার ঐশ্বর্য্য! আমাদের এই নিরক্ষর দেশেও শরৎচন্দ্রের পাঠকসংখ্যা যত তার অর্দ্ধেক লোকও যদি তাঁর বই কেনে পড়ত তাহ'লে তাঁর সাহিত্য-সাধনার আয়ের অঙ্কটা সাধারণকে জানাবার মত একটা কিছু হোত তাতে সন্দেহ নেই। সুদূর প্যারি নগরীতে তাঁর 'শ্রীকান্ত'র ফরাসী অনুবাদ বিক্রয় হ'চ্ছে দেখে এসেছি,

যদিও 'শ্রীকান্তে'র লেখক বাংলার পল্লীগ্রামে ব'সে তার কোনো খবরই রাখ্‌তেন না। দেশে ফিরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম যেদিন ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের সৌভাগ্য পেয়েছিলাম, সেই দিনই তাঁকে সেকথা বলেছিলাম। শুনে তিনি বিস্মিত হ'য়েছিলেন!

"শ্রীকান্ত"'র মত বই ফরাসী ভাষায় অনূদিত হ'য়ে ফরাসী দেশে বিক্রয় হ'চ্চে,—এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু শরৎচন্দ্র এতে বিস্মিত হ'য়েছিলেন। এক জাতীয় বড়ো লোক আছেন যাঁরা অনেক সময়েই তাঁদের মহত্বের পরিমাণটা ঠিক বুঝ্‌তে পারেন না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যতবার দেখা হ'য়েছে, ততবারই আমার মনে হয়েছে তিনি এই জাতীয় লোক,—আপনার মহত্ব সম্বন্ধে একেবারে অচেতন। এবং এই থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝেছি, যে বাংলা-সাহিত্যে যা' কিছু স্থায়ী সম্পদ তিনি দান করেছেন তার উদ্ভবও হ'য়েছে তাঁর এই আত্মভোলা ভাব থেকে।

কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। বেশি বই পড়া আমার অভ্যাস নেই। তাই যা-কিছু শরৎচন্দ্র লিখেচেন, সব এখনো আমার পড়া হ'য়ে উঠে নি। কিন্তু তাই বলে আমার শরৎ-পরিচয় অসম্পূর্ণ একথা বল্‌তে পারি নে। তার কারণ, অল্প কয়েকখানি বইএর মধ্যে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে বোধ হয় কম লেখকই পেরেছেন। তাঁর আত্ম-বিস্মৃতি তাঁকে কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখ্‌তে দেয় নি। তাঁর সাহিত্য তাঁর প্রাণ থেকে সহজ ধারায় বেরিয়ে এসেচে। কোথাও তিনি তার গতিরোধ করেন নি। সেজন্য তাঁর কোনো কোনো বই না পড়ার দরুণ শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে

আমার জ্ঞানের যতই অভাব থাকুক না কেন, আমার শরৎ-পরিচয়ের গাঁথুনির মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক নেই। এটাকে যদি শরৎ-সাহিত্যের একটা দোষ বলে ধরা যায়, তবে উত্তরে বলা যেতে পারে শরৎ-সাহিত্যের যা' শ্রেষ্ঠগুণ তারও উৎস এইখানে। শরৎচন্দ্রের আত্মভোলা মন অতি সহজেই অনাসক্ত ও objective হ'তে পরেছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে একদিকে যেমন পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়,—অপরদিকে তেমনি পরিপূর্ণভাবে আত্মগোপনও করতে হয়। অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের মধ্যে দেখা যায় তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্ম্মগুলো তাঁদের লেখার মধ্যে নির্লজ্জ নিরাবরণে পাঠকের অন্তরকে ক্লিষ্ট করে। শরৎচন্দ্র যখন কোনো উপন্যাসে নিজের মত ব্যক্ত করতেও চেয়েছেন, সেখানেও তিনি উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর ন্যায় আত্ম-গোপন করতেও সমর্থ হ'য়েছেন। তাই তাঁর লেখার মধ্যে এমন একটা সার্ব্বজনীন অবেদন। বস্তুতঃ একটা জাতির অন্তরতম অনুভূতি ও আবেগ প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করা,—তা' এমনই একটা আত্ম-বিস্মৃত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। শরৎচন্দ্রের যে-কোনো বইয়ের মাত্র কয়েক পাতা পড়লেই যেন বাংলার পল্লী-সমাজের ও আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নরনারীর হৃদয়ের সুরটি তার মধ্যে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে। যাঁদের মধ্যে তিনি বাস করেছেন, তাঁর দীপ্ত প্রতিভা তাঁদের থেকে কখনো তাঁকে পৃথক করে দেয় নি। এই জন্যই তাঁর সাহিত্যে তিনি বাংলা দেশকে এত স্থায়ী সম্পদ দান করতে পেরেছেন; এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব, এইজন্যই বাংলাদেশ তাঁকে চিরকাল ভালোবাস্‌বে।

শরৎ-বন্দনা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শ্রাবণের ধারা ঝরিয়া গিয়াছে—
বন্দনা করে শিউলী বন!
নীলাকাশতলে কী আলো উথলে!
কাশফুলে রচে আলিম্পন!
সোনার ধরণী শ্যাম-মরকতে
বেদী রচিয়াছে বরিতে শরতে,
আকাশে বাতাসে ঐ ভেসে আসে
আজি শরতের আমন্ত্রণ!
এমনি সে কোন্ শুভ-সুলগন!
বাণীর কমল-কানন হ'তে
এলে, নেমে এলে শরৎ-চন্দ্র
শারদ-জ্যোস্না-অমিয়া-স্রোতে!
সেই হ'তে এই আমাদের দেশে
প্রাতে রবি, রাতে শশী ওঠে হেসে,
মোদের ভারতী, কিরণ-ধারায়
নিয়ত করেন সন্তরণ!
বাঙ্লার নভে শরতের চাঁদ,—
তুলনা তাহার কোথাও নাই!

দীর্ঘ বরষ ব্যাপিয়া, তোমায়
মোরা যেন এই গগনে পাই !
পূর্ণিমা রাতি আসে আর যায়—
এই 'কোজাগর' যেন না পোহায় !
বাঙ্‌লার ছেলে, বাণীর দুলালে,
এক হয়ে আজ ভুলা'লে মন !

শরৎচন্দ্রের লিখন-ভঙ্গী

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল

রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় বাংলার সাহিত্য গগন যখন আলোকিত, এবং তাঁহার রশ্মিতে প্রতিভাত হইয়া যখন অসংখ্য সাহিত্য রথিদের কলরবে চারিদিকে হাটের গোলমাল সুরু হইয়াছে, তখন সেই কলরবকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করিয়া যাঁহার লেখনী জয়যুক্ত হইয়া উঠিল—তিনিই শরৎচন্দ্র। তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন কিনা জানি না, কিন্তু বাংলার কথা-সাহিত্য একটী নবরূপে নব ভঙ্গিমায় একটী নূতন চেতনাশক্তির সন্ধান পাইল। যাঁহারা এই নবীন আগন্তুকের এমনি আকস্মিক আবির্ভাবে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার প্রসারের পথ রুদ্ধ করিবার কত আয়োজনই না করিলেন। কিন্তু কালের উদ্দাম স্রোতে আজ কে কোন্ নিরালায় যে আত্মগোপন করিয়াছেন, তাহার কোন সংবাদই আর শ্রুতিগোচর হয় না। চিরদিন চিরকাল ইহা একটী পরম সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে যাহা বড় তাহার চাপে ছোটোর বাঁচিয়া থাকিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ইহা এমনিই অদ্ভুত যে রবীন্দ্রনাথের এত বড় চাপে শরৎচন্দ্র আজও সগৌরবে বাঁচিয়া রহিয়াছেন।

যাহার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের এত বড় শক্তিও নিস্তেজ হইয়া

পড়িল, আসলে সে বস্তুটী কি? ইহার উত্তরে যাহা সর্ব্বাগ্রেই উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি, তাহা হইতেছে শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব লিখন ভঙ্গিমা। কি কথার সরসতায়, কি বাক্যের সাবলীল স্বচ্ছ ক্ষিপ্রতায়, কি ভাবধারার সুচতুর প্রকাশ-মাধুর্য্যে শরৎচন্দ্রের লেখনী যেন ঐন্দ্রজালিকের মত আমাদের চিত্তে মোহের সঞ্চার করে। বাংলা সাহিত্যের প্রবেশ-পথে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের সহিতই আলাপ-পরিচয়ের অবসর ঘটে। তারপর রবীন্দ্রনাথের শক্তির পদতলে মস্তক অবনত করিয়া যখন শরৎ সাহিত্যের দুয়ারে আসিয়া পৌছায় তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে। মনে মনে বলি, বাংলা ভাষার অন্তরে যে মধুর উৎস নিহিত আছে, সে সন্ধান আর ত কোথাও পাই নাই। শরৎচন্দ্র, তুমিই তাহার সন্ধান দিলে।

মনে হয় শরৎচন্দ্র যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং এত রকমের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আজ সকলের পূজার পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান হেতু তাঁহার মোহনীয় লিখন-ভঙ্গিমা। এই লেখার প্রতি ছত্রে তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্বও এম্নি সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে একটু চেষ্টা করিলেই তাহা সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। প্রকৃত স্রষ্টা যিনি তিনি কখনো অপরের ভঙ্গিমা অনুকরণ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন না। যিনি জীবনে যথার্থ কিছু উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনি যখন সেই অনুভূতিকে ভাষায় রূপান্তরিত করেন, তখন সেই ভাষার মধ্যে একটী নব-জীবনের চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যায়। ইহার অন্যথা হইলে বুঝিতে হইবে অনুভূতি তাঁহার সম্পূর্ণ হয় নাই, কিংবা তিনি যাহা তাঁহার জীবনের অনুভূতি মনে করিয়াছেন, প্রকৃত

পক্ষে তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে। ইংরাজীতে একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে যে every spirit builds its own house. সাহিত্য-স্রষ্টার জীবনে এই উক্তিটীর সত্যতা যথার্থ প্রমাণিত হয়। কিন্তু স্রষ্টার জীবনে যাহা সত্য, অপরের জীবনে তাহা মিথ্যারই নামান্তর মাত্র। যাঁহারা মিথ্যা নামের মোহে পড়িয়া কিংবা খেয়ালের বশে সাহিত্যের সেবা করিতে উৎসুক, তাঁহাদের রচনা সাধারণতঃ ক্লিষ্ট ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু জীবনকে যিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি যখন সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন, তখন তাঁহার লেখার মধ্যে এমন একটী বিশিষ্ট সুরের ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে যে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে আর আমাদের কষ্ট হয় না। স্রষ্টার রচনার সঙ্গে তাঁহার এই যে অভেদ্য সম্পর্ক, শরৎ-সাহিত্য ইহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গ্রন্থরাজি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিলেও কোথাও এতখানি নিবিড় আত্মীয়তার সন্ধান পাওয়া যায় না। হৃদয়ের যে আন্তরিকতা ভাষা ও ভাব সম্মিলনে একটী অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠে, শরৎচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক মনীষীদের মধ্যে তাহার এতখানি গভীরতা নাই বলিয়াই মনে হয়। কি গল্প রচনায়, কি উপন্যাস রচনায়, কি প্রবন্ধ রচনায় এই আন্তরিকতার সুরই তাঁহার জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি। যাঁহারা তাঁহার মতের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করিতে অপারক, তাঁহারাও এই সুমধুর চিত্তজয়ী সুরটীকে অবহেলা করিতে পারেন না।

'শেষপ্রশ্নে'র কমলকে লইয়া চারিদিকে কোলাহলের আর বিরাম নাই। তাহার মতবাদে সমাজের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, সে

বিচার এখানে করিব না। কিন্তু যাহাকে লইয়া এতখানি চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়াছে, সেই কমলকে এতটা বড় করিয়া দেখিবার হেতু কি? সে যদি এমন কিছুই প্রচার করিতে চাহে যাহা কিছুতেই সত্য নহে, তাহা হইলে তাহাকে সম্পূর্ণ উপহাস করাই ত বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এত সহজে তাহাকে উপহাস করা চলে না! কারণ, সে যে শরৎচন্দ্রের শিল্পী-হৃদয়ের মানস কন্যা। শরৎচন্দ্র যে তাহাকে তাঁহার চিত্তের সমস্ত আন্তরিকতায় নিঃশেষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাই যে ভাষায় সে কথা কহে তাহা এম্নি তীক্ষ্ণ যে ঠিক বুকের মাঝখানটিতে তাহা সজোরে আঘাত করে—আত্মরক্ষায় ছুটিয়া পলাইবার পথটুকু পর্য্যন্ত আর চোখে পড়ে না।

সকল আইন কানুনের মূল ভিত্তি 'sanction'. এই 'sanction'ই রাষ্ট্রীয় জীবনের গতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। যাহার পিছনে ইহার শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না, তাহাকে অবহেলা করিতে আমাদের এতটুকু বাধে না। কিন্তু এই 'sanction'এর আচরণে যাহা সুরক্ষিত তাহাকে অবহেলা করিতে আমাদের দুশ্চিন্তার আর অবধি থাকে না। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে এম্নি একটা 'sanction'এর প্রভাব সদাই অনুভব করা যায়। যাহাকে ভাল লাগে না, তাহাকে ঘৃণা করি, এ কথা জোর করিয়া কখনো বলা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ শরৎচন্দ্র তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির পিছনে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তাই তাহাদের প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রতিটি ছত্র তাঁহার হৃদয়ের আন্তরিকতায় উজ্জ্বল।

শিয়রে স্তব্ধ আসিয়া দাঁড়ালে

শ্রীমনোজ বসু

মুখোমুখি শুধু চাঁদ ও ধরণী নিশিরাতে নির্ব্বাক
হোথা গাঙ আর আবছায়া পথ···ঘুমন্ত বধূ পাশে
ঘুম ভেঙে গেল ; হঠাৎ শব্দ আসে—
কোন্ বন হ'তে ছুটে আসিছে কি ক্ষেপা হাতি লাথে লাথ ?
বাঁধ ভেঙে যেন বন্যা আসিয়া আছাড়ে বন্ধ দ্বারে—
রাত্রি ফাড়িয়া কোথা হীরাসিং দূরপথ আঁধিয়ারে
'রেডি' বলে দেয় হাঁক।
জেগে দেখিলাম, তুমি আসিয়াছ ; আসিয়া নির্ণিমিখ
শিয়রে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে রয়েছ। ঘুমন্ত চারিদিক।

স্বপ্ন-শিয়রে দীপ কাঁপে, আর নীলাকাশে কাঁপে চাঁদ
চাঁদে ঝলমল তব চুল উড়ে।···নিঃসাড়ে রাত বাড়ে।
বাহিরে ওদিকে জানালার ওইধারে
গাঙে পাড় ভাঙে। হাঁকে হীরাসিং। মহাকাল উন্মাদ !
তুমি কি বুলালে মায়া-অঞ্জন আমার দু'চোখ ভরি—
দেখি, এলোচুলে গাঙপারে এক বিষাদিনী মরি মরি !
—হীরাসিং হোথা হাঁকে সেই সংবাদ।

কি মায়া ছড়ালে! সারা বাংলার নদী মাঠ বাট গ্রাম
এক প্রতিমার রূপে দাঁড়াইল; অপরূপ হেরিলাম!
দুর্গম পথ দাবী জানাইছে। চঞ্চল কুতুহলী
প্রাণপাখী উড়ে উছলি' অন্ধকার।...
হায়, চঞ্চল পাখে যে জড়াল আলুলিত কেশভার—
ঘুমাইছে প্রিয়া; নিশিরাতে পাশে ঘুমায় পদ্মকলি।
তুমি চুপি চুপি কি মায়া বুলালে, মাখালে চোখে কি সোনা
আমি দেখিতেছি—দেখি আর দেখি—দেখে সাধ মিটিল না
এত রূপ ফোটে 'পোড়া কাঠ' উজ্জ্বলি'!
মাটি ও মানুষ সবি খাঁটি সোনা!—বড় বিস্ময় লাগে
ঘরে আর পথে এত ভালবাসা, কে তাহা জানিত আগে?

ঘর আর পথ—মাটি ও মানুষ বিছাল স্বপ্নজাল—
আগু গেলে পিছে আকুল অশ্রু জমে
নিশিরাতে আমি থমকি দাঁড়াই ঘর-পথ-সঙ্গমে।
ভীরু মনে আজ শত-প্রশ্নের ঢেউ ভাঙে উত্তাল।
আঙিনা ঘেরিয়া প্রাণ-ধারাটুকু বেশ ত' বহিত খাসা—
মায়াবী, তুমি এ কি মহাজোয়ার আনিলে সর্ব্বনাশা
বাঁধ-বেড়া ভেঙে রাখে না অন্তরাল।
শাণিত সত্য আজ মুখোমুখি। স্তম্ভিত বিভাবরী।
আর শিয়রেতে তুমি দাঁড়ায়েছ। তোমারে প্রণাম করি।

শিশু-চরিত্রে শরৎচন্দ্র

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

১

শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌তে গেলে অনেকবার বলা সেই পুরাণো কথাটাই বল্‌তে হয়, যে, শরৎচন্দ্র দরদী—তাই তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের সমস্ত সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, ন্যায় অন্যায় নিয়ে তাঁর মমতার স্নেহস্পর্শে যেমন অপরূপ হয়ে দেখা দেয়, এমনটি আর কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না। তাঁর এই দরদ কেবল বড় বড় চরিত্র-গুলির ওপরেই নয়—শরৎসাহিত্য কেবল পরিণত মনের চিন্তাধারা নিয়েই ব্যাপৃত থাকে নি, শিশুমনের যে ভাবধারা নব নব বিস্ময় ও অত্যদ্ভুত কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে বয়ে চলে সে দিক্‌টাও তিনি সমান দক্ষতা ও মমতার সঙ্গেই এঁকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কাব্যের মধ্যে শিশুচরিত্রের এই অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ আমরা প্রথম দেখতে পাই। তার পরেই এলেন শরৎচন্দ্র। ছোট ছেলের চরিত্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসের অনেক স্থানেই আছে; কয়েকটিতে তারা মুখ্যস্থান জুড়ে আছে, অন্যগুলিতে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে গেছে, কিন্তু সবগুলিতেই তাদের কথায়, ব্যবহারে ও ও চিন্তাপ্রণালীতে তারা আমাদের মনের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়।

শরৎচন্দ্রের এই শিশু-চরিত্রগুলিকে কয়েকটি distinct typeএ ভাগ করা যায়। Type তাদের অনেকটা এক রকম বল্‌ছি বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে একই চরিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন নাম দিয়ে দেখান হ'য়েছে। তাদের মধ্যে যা মিল সে কেবল ওই outlineটুকু, কারণ শিশুমনের গড়ন অনেকটা একরকমই হ'য়ে থাকে, কাজেই সেদিক দিয়ে মিল না থাকাটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। অন্তরের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেটা একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

এখন এই typeগুলির শ্রেণী বিভাগ ক'রে আলোচনা কর্‌তে গেলে যতটা স্থানের আবশ্যক, এখানে তা নেই। তবু মোটামুটি গোটা-কতক কথা বলা চলে।

প্রথমেই ধরা যাক্ মেজদিদির কেষ্ট। এই typeএর আরও গুটিকতক চরিত্র আছে যেমন, কাঙালী, পরেশ, গদাধর ইত্যাদি। এরা সকলেই দুঃখের মধ্যে মানুষ, অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, মুখ তুলে কোন কথার প্রতিবাদ কর্‌তে পারে না, কিন্তু যে যথার্থ স্নেহ করে তাকে সহজেই চিনতে পারে। সে চেনা এত নিবিড়, তার প্রতি ভালবাসা তাদের এত গভীর যে তার স্নেহলাভের জন্য, তাকে খুসী কর্‌বার জন্য সব কিছু নির্য্যাতনই তারা মাথা পেতে নেয়। অথচ সেই স্নেহপরায়ণা নারীদের কাছে তারা কোন আবদার জানাতে সাহস করে না; যদি কোন কথা বল্‌তে চায় তাও বলে অতি ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত।

আর এক typeএর চরিত্র আছে, তারা ঠিক উপরোক্ত চরিত্র-

গুলির একেবারে উল্‌টো। তারা অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির, গোঁয়ার ও একরোখা, কাউকে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যদি কেউ ভালবাসে তা' বুঝ্‌তে পারে, তার ওপর অভিমান করে, তাকে আব্দার জানায়, আবার নিজের খুসীমত কাজ না পেলে তাকেই আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে একাকার করে। 'রামের সুমতি'র রাম ও 'মামলার ফলে'র গয়ারাম এই typeএর।

এ ছাড়া আরও ছোট খাট অনেক চরিত্র আছে! দৃষ্টান্তস্বরূপ নাম করা যেতে পারে, ছেলেবেলার শ্রীকান্ত, মেজদা, ছোড়দা, যতীনদা, অতুল, হরিচরণ, কানাই, বিপিন, অমূল্য, নরেন প্রভৃতি।

২

এই তো গেল মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ। এখন এদের মধ্যে গোটা-কতককে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

বিনম্র, নিরীহ, লাজুক কেষ্ট মেজদিদির কাছে মায়ের স্নেহ পেয়ে কাঙালের মত তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাই সময় পেলেই সে মেজদিদির কাছে ছুটে যেতে চায়। মুখ ফুটে কোনদিন সে কারও কাছে কিছু বলে না, সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'রে যায়, কিন্তু মেজদির দু' একটি স্নেহের কথায় তার চোখে জল ভরে উঠে। প্রকৃত স্নেহ জিনিসটা ছেলেরা বেশ বুঝ্‌তে পারে। এই স্নেহপরায়ণা মেজদি যদি কখনও ধমক দেন, সে বুঝ্‌তে পারে এটা তাঁর অন্তরের কথা নয়, তবুও সে থতমত খেয়ে ভরসাহারা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে।

কেষ্ট বেশী কথা বল্‌তে পারে না, তাই প্রথম যেদিন মেজদির অসুখ শুনে তা'কে দেখ্‌তে এসেছিল তখন মলিন কোঁচার খুঁট খুলে ছুটি আধপাকা পেয়ারা বার ক'রে কেবলমাত্র বলেছিল, "জ্বরের ওপর খেতে বেশ।" কিন্তু এই কথা কটিই যথেষ্ট। এইটুকুতেই মেজদির প্রতি স্বল্পভাষী বালকের কী গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে সে কথা বুঝতে পাঠকের একটুও বাধে না, সমস্তদিন দোকান পালিয়ে রোদে ঘুরে ঘুরে এই অকালের পেয়ারা ছুটি যে তার কত দুঃখের সংগ্রহ করা জিনিস, সে কথা সে নাই বা জানালে।

আর একদিনের একটি ছোট ঘটনা। কেষ্ট ভয়ে ভয়ে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল, ভেতরে ঢোকবার মত সাহস নেই। হেমাঙ্গিণী যখন তাকে ডেকে কাছে বসালেন সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এ কান্না তার নিজের কোন দুঃখে নয়, নিজের জন্য সে চোখের জল বড় একটা ফেলে না, তার এই কান্নার কারণ জান্‌তে গিয়ে শোনা গেল—"ডাক্তার বলে যে বুকে সর্দ্দি বসেছে।" এখানেও মেজদির জন্য তার বালক মনের সমস্ত ভয় ও ভাবনা প্রকাশ করতে ঐ কথা ক'টিই যথেষ্ট।

তারপরে পূজো দিতে যাবার জন্য তার সেই উৎসাহ, তার আর সবুর সয় না, অমন দুর্দ্দান্ত দিদির শাসনপাশও সে অগ্রাহ্য কর্‌তে পারে মেজদিদির জন্য, তাই মারধোরের কথা শুনে প্রথমটা একটু দমে গেলেও পরক্ষণেই প্রফুল্ল হ'য়ে বলে—"মারুক্ গে! তোমার অসুখ সেরে যাবে তো।" এই কথায় কেষ্টর স্নেহব্যাকুল ছবিটি খুব স্পষ্ট হ'য়েই চোখের সামনে ফুটে উঠে।

শেষে এই কেষ্ট গয়লাদের কাছে আদায় করা টাকা তিনটে নিয়ে মেজদিদির জন্ত পূজো দিয়ে এল। এতখানি সাহস তার হ'ল কি ক'রে? কী সে বস্তু যা তাকে অমন দুর্দ্দান্ত দিদির শাসনপাশকে অগ্রাহ্য করতে প্ররোচিত করলে? তার পীড়িত বালকহৃদয় যে মাকে অহরহ খুঁজে খুঁজে ফিরছে, মেজদির মধ্যে সে তাঁকে খুঁজে পেয়েছে, এখন তার বড় ভয় এই মেজদিকে পাছে সে হারায়। তাই এই নির্ব্বোধ ভীরু বালক এমন অসম সাহসের কাজ করতে পারলে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীও যখন ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'য়ে তার গালে চড় কসিয়ে দিয়ে বললেন—"হারামজাদা চোর, আমি তোকে চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েছি? কতদিন তোকে আমার বাড়ী ঢুকতে বারণ করেছি, কতবার তোকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্ছে, তুই চুরির মৎলবেই যখন তখন উঁকি মেরে দেখ্‌তিস্"—তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই কেষ্টর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, অকৃত্রিম বিস্ময়ে তার দুটি বড় বড় চোখে সে মেজদির চোখের দিকে চেয়ে যেন বলছে, "একি বলছো মেজদি, তুমি একি বলছো।" সে বুঝ্‌তে পারে মেজদির এই চড় মারাটা যেমন মিথ্যে, তাঁর এই অভিযোগও তেমনিই মিথ্যে, সে কেবল বুঝতে পারে না, কেন তার সেই স্নেহপরায়ণা মেজদি সব জেনেও এত লোকের সাম্‌নে এমন ভাবে তাকে এই অপমানটা করলেন। মেজদির প্রতি অভিমানে তার ছোট বুকটি ভরে' উঠে, তাই বাড়ী নিয়ে গিয়ে বড় কর্ত্তা যখন চোরের শাস্তি সুরু করলেন, তখন "কেষ্ট কথাও কহে না, কাঁদেও না, এদিকে মারিলে ওদিকে মুখ ফিরায়, ওদিকে মারিলে এদিকে মুখ ফিরায়।"

শেষ দৃশ্যটিই আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করে। পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে হেমাঙ্গিনী ডাক্‌লেন, "কেষ্ট"-অমনি কেষ্টর সব অভিমান কোথায় ভেসে গেল। কাল্‌কের ঘটনার পরও যে মেজদি আবার তার কাছে আস্‌তে পারে, এতটা সে ভাব্‌তে পারে নি। তাই তাঁকে বস্‌তে দেবার জন্য কেষ্টর সে কি উৎসাহ, সে কি ব্যস্তসমস্ত ভাব—নিজের বেদনা ভুলে গিয়ে কেষ্ট তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, কোঁচা দিয়ে ছেঁড়া মাদুর ঝাড়্‌ছে—মুখে তার একমুখ সলজ্জ হাসি!

৩

অভাগীর ছেলে কাঙালী—তার ছোট জীবনের করুণ অধ্যায়টুকুকে লেখকও ছোট করেই এঁকেছেন, কিন্তু এই ছোট কাহিনীটুকুই কী ব্যথাময় ও মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। একদিক দিকে কাঙালীর সঙ্গে কেষ্টর অনেকটা সাদৃশ্য আছে, দুজনেই নিরীহ প্রকৃতির ও লাজুক, তবে কাঙালী একটু forward, যদিও সেটা অনেকটা দায়ে পড়ে, তাই সে গোমস্তা অধর রায়ের কাছে নালিশ জানাতে যায়। গোমস্তা তার গোমস্তাগিরি চালেই জবাব দিলে, "দুলে! দুলের মড়ার কাঠ কি হ'বে শুনি?" তার উত্তরে কাঙালী বলেছিল—"মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস্ কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সকলে শুনেছে যে।" হাজার দায়ে পড়্‌লেও কেষ্ট বোধ হয় এত কথা বল্‌তে পার্‌তো না, বল্‌লেও কয়েকটি কথায় সে তার আবেদন পেশ কর্‌তো। কিন্তু কাঙালী তার শিশুমনের

ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে ঠিক কাঙালীর মত করেই। অবশেষে এই কাঙালীর মনে কয়েকঘণ্টার মধ্যে সংসারকে দেখে যে বৈরাগ্যের ভাবে দেখা দেয়, তা' জগতের সকলের ওপর তার বালকমনের নিগূঢ় অভিমানের এক অভিনব প্রতিচ্ছবি। সে ভাবে, এক মা ছাড়া জগতের আর সকলেই এই রকম হৃদয়হীন। তাই অবশেষে এক আঁটি খড় জেলে মায়ের মুখে স্পর্শ করিয়ে যখন সে ফেলে দিলে তখন "সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে গল্প ধোঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া রহিল।"

তাহার এই একান্ত স্তব্ধ ভাব, নিষ্পলক দৃষ্টি এ যে কেবল তার অন্তরের সুগভীর ব্যথারই প্রকাশ, তা মনে হয় না। তার এই স্তব্ধ দৃষ্টি দেখে মনে হয় তার মনে একটা ক্ষীণ আশাও ছিল। যেমন করেই হোক্ আগুন তো সে দিয়েছে, হলই বা এক আঁটি খড়? বামুন মায়ের মত অত বড় না হোক্ একটা ছোটখাট রথও কি আস্‌বে না? মা যে বলেছিল—"ছেলের হাতের আগুন, সে কি সোজা কথা? রথকে আস্‌তেই হবে।" ছেলেবেলা থেকে মায়ের কথা বিশ্বাস করাই তার অভ্যাস, তাই সে রথের চাকাটা যদি একবার দেখা যায় এই আশায় তার পলকহীন চক্ষু সেই ধোঁয়ার দিকেই আবদ্ধ হ'য়ে রইল, অন্যমনস্ক হ'লে হয়তো কখন রথটা বেরিয়ে যাবে, তার দেখা হবে না।

৪

'রামের সুমতির' রাম ও 'মামলার ফলের' গয়ারাম অনেকটা এক ধরণের। দু'জনেই গোঁয়ার, রাগ্‌লে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, কিন্তু দুজনেই ভালবাসে যাঁরা তাদের মায়ের স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের। তাদের এই ভালবাসার জন্যেই তারা অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে,—অতি-সাধারণ, দুর্দ্দান্ত ও একান্ত অশিষ্ট ছেলের মনের মধ্যেও যে কতবড় স্নেহের উৎস লুকান থাকে, তা শরৎচন্দ্র এই দুটি চরিত্রে যেমন দেখিয়েছেন এমন আর কেউ পারলেন না।

এই রাম ও গয়ার মধ্যে পার্থক্যও আছে অনেক। রামের যত অত্যাচার অধিকাংশই বাইরের লোকের প্রতি, তাকে পাড়ার লোক ভয় করে, ডাক্তারকে সে বৌদির জ্বর না সারার জন্য শাসিয়ে আসে। বৌদিকে সে ভালবাসে, তাঁকে কোন দিন যে সে কোন আঘাত দিতে পারে এ কথা সে কল্পনা করতে পারে না। বয়সেও সে গয়ার ছোট, তাই বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে বসে থাকে, লজ্জা পেলে তাঁর বুকে মুখ লুকোয়। সে মঙ্গলবারে অশথ গাছ পুঁতেছিল, নারায়ণী যখন বল্‌লেন,—"মঙ্গলবার অশথ গাছ পুঁতলে বাড়ীর বড় বৌ মারা যায়।" তখন প্রথমটা অবিশ্বাস করলেও শেষকালে ব্যাকুল হ'য়ে বলে—"কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি?" এবং এই জন্য সে তার অশথ গাছ ফেলে দেবার জন্যে আর কোন কথা বল্‌লে না, নইলে সে যে কি অনর্থ বাধাত তা আন্দাজ করা শক্ত নয়।

রাম জানে এক বৌদিই তাকে ভালবাসে, আর সকলেই তাকে

মন্দ বলে, গাল দেয়, দেখ্‌তে পারে না। তাই এই বৌদি ছাড়া আর কাউকে সে গ্রাহ্য করে না। এই বৌদির ওপর তার কতখানি নির্ভর, তা তাকে পৃথক্ করে দেবার পর বুঝ্‌তে পারা যায়। প্রথমটা সে অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করে,—কখনো শাসায়, কখনো কৃত্রিম উল্লাস দেখিয়ে বলে সে বেশ মজা করে রাঁধ্‌বে, আর একলা পেট ভরে খাবে। এমনি কত অর্থহীন ও অসংলগ্ন কথা।

ওদিকে যত সময় যায়, তার তেজ একটু একটু করে' কমে আসে, স্বরও একটু একটু করে থামে—"আমার কাঠ কই, আমি রাঁধ্‌বো কি দিয়ে? আমার শিল নোড়া কই, আমি বাট্‌না বাট্‌বো কিসে?" উত্তরে নেত্য ও ঘর থেকে বল্‌লে—"মা বল্‌ছেন কাল শিল-নোড়া কিনে দেবেন।" রাম "না, আমি শিল-নোড়া চাইনে," বলে কেঁদে ঘর ছেড়ে চলে গেল। এই দৃশ্যটিতে লেখক বৌদির প্রতি রামের নির্ভরশীলতার যে ছবি দিয়েছেন, তা এর চেয়ে স্পষ্ট ও সুন্দর করে বলা যেত না। যে তাকে পৃথক্ ক'রে দিয়েছে, তার কাছেই সে নালিশ জানায়, বলে, 'তুমি পৃথক্ না হয় করে দিলে, কিন্তু আমার শিল-নোড়ার ব্যবস্থা করে দিলে না কেন?' তুমি ছাড়া এ আর কে করবে? অথচ শিল-নোড়া পাবার আশ্বাসে তার রুদ্ধ অভিমান আলোড়িত হ'য়ে ওঠে। সে কেঁদে যখন ঘর ছেড়ে চলে যায়, সে কান্নার অর্থ এই—'আমি কি সত্যিই তাই চাইছি? তুমি তো আমার সব বোঝ, তবে আজ এমন অবুঝের মত কথা বল্‌লে কেন? তুমি কি জান না কেন আমি একথা বল্‌ছি? তুমি কি সত্যিই মনে কর আমি শিল-নোড়া পেলেই, আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে?'

আর সেই যে একটা কাঁচা পেয়ারা বার বার কপালের ওপর ঠুকে তার আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার চেষ্টা—কোথাও কি এর তুলনা আছে! অজান্তে বৌদিকে আঘাত করে তার মনটা যে ভেতরে ভেতরে কতখানি কাঁদ্ছিল, তার শিশুহৃদয়ের এই সুগভীর বেদনার পরিমাণ আর কোন রকমেই কি এমন করে প্রকাশ করা যেত?

এদিকে গয়ারামের যত উপদ্রব সব তার জেঠাইমার ওপর। বাইরে সে কতখানি দুষ্টামি করে তা আমরা জানি না। বয়সেও সে রামের চেয়ে অনেক বড়। জেঠাই মাকে সে ভালবাসে, কিন্তু তাঁর প্রতি তার ব্যবহার একদিকে যেমন কর্কশ ও রূঢ়, অন্যদিকে তেমনি অশোভন। জেঠাইমার প্রতি 'আবাগী', 'রাক্ষুসী' প্রতি সম্বোধন গুলোও তার মুখে বাধে না। তার ধারণা, সে যে ঠিক সময়ে নায় খায়, এতে তার জেঠাইমারই লাভ, এর দ্বারা তাকে সে কৃতার্থ করে দেয়। জেঠাইমা যদি বলে খেতে দিতে পারবে না, তার উত্তরে সে তৎক্ষণাৎ বলে—"তুই দিবি না তো কে দেবে?" এ যেন তার সঙ্গে বাঁধা ধরা contract করা আছে। তার যদি কোন অমঙ্গল হয়, সে জানে তাতে জেঠাইমার প্রাণেই বেশী ব্যথা লাগ্‌বে, তাই ফাটকে দেবার ভয় দেখালে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলে, "ইঃ—তুই আমাকে ফাটকে দিবি? দেনা, দিয়ে একবার মজা দেখ্‌না!—আপ্‌নিই কেঁদে কেঁদে মরে যাবি,—আমার কি হবে।" জেঠাইমার দুর্ব্বলতা যে কোথায় সেটা সে বুঝ্‌তে পেরেছিল জেঠাইমার প্রতি তার অন্তরের সুগভীর ভালবাসার মধ্যে দিয়ে।

৫

এই তো গেল বড় বড় চরিত্রগুলি। এদিকে যে সব ছোটখাট চরিত্র নানা গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, সেগুলিও রসে, ভাবে ও কল্পনা-বৈচিত্র্যে সুসম্পূর্ণ।

দত্তার মধ্যে বিজয়া, নরেন, রাসবিহারী, বিলাসবিহারী, দয়াল প্রভৃতি চরিত্রগুলিই বড় করে চোখে পড়ে কিন্তু তারই মধ্যে পরেশের মায়ের ছোট্ট পরেশের কথাও ভুলে থাকা যায় না, অথচ অতবড় বইখানার কতটুকু স্থানই বা সে জুড়ে আছে। চওড়া পাড়-ওয়ালা কাপড়ের লোভে সে বিজয়ার জন্যে বাতাসা কিনতে গেল—সে জানে এইটাই তার আসল কাজ, নরেনের খবরটা জানা, ও কেবল লোককে ফাঁকি দেবার জন্য। তাই যখন সে এগার গণ্ডার জায়গায় বারগণ্ডা সওদা করে মাঠানকে তাক্ লাগিয়ে দেবার কল্পনায় বিভোর, তখন বিজয়ার অচিন্ত্যনীয় রূঢ়তায় তার মুখ মলিন হ'য়ে যায়, সে ভয়ে ভয়ে বলে—"এর বেশী যে দেয় না মাঠান্।" নির্ব্বোধ বালকের এই সকরুণ কৈফিয়ৎ শুনে পাঠকের পক্ষে একদিকে যেমন হাসি সাম্‌লানো শক্ত হ'য়ে পড়ে, তেমনি তার ম্লান মুখচ্ছবি ও ভয়ে ভরা অস্ফুটোক্তিতে তার প্রতি মমতায় মন ভরে ওঠে।

'দেবদাস' বইখানি শেষ করে, উচ্ছৃঙ্খল দেবদাসের করুণ কাহিনীই পাঠকের মন অধিকার করে থাকে, কিন্তু ছোট বয়সের সেই পাঠশালার দেবদাস ও পার্ব্বতীর ভালবাসার কাহিনী, সেই কি কম! দেব-দাসের সেই বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসে গম্ভীরভাবে হুঁকো টানা,

পার্ব্বতীকে সময়ে অসময়ে প্রহার করা, আবার পার্ব্বতীর গালের কঞ্চির নীল দাগগুলো সযত্নে পরীক্ষা করে নিঃশ্বাস ফেলে বলা—"আহা বড় লেগেছে, না রে পারু ?...আহা, কেন অমন করিস্, তাইতো রাগ হয়—তাই তো মারি।" এম্‌নি কত ছোট খাট তুচ্ছ ঘটনার সমাবেশে এই দুটি ছেলে মেয়ের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আবার তিনটি টাকাই বৈষ্ণবী তিনজনকে দিয়ে পার্ব্বতীর সেই ভয় ভয় ভাব, তারপর দেবদাসের দু'টাকার কড়াক্রান্তি হিসাবের উল্লেখে পার্ব্বতীর সেই জবাব—"তারা কি তোমার মত আঁক কস্‌তে জানে ?"—এও বড় কম উপভোগ্য নয়। পার্ব্বতী দেবদাসের হাত ধরে বলেছিল—"আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে মারবে দেবদা !" দেবদাস উত্তর দিলে, "দূর, না দোষ কর্‌লে কি আমি মারি ?" যে কাজ সে করে ফেলেছে তারপরে দেবদাসের কাছে মার খাবার ভয় পার্ব্বতীর পক্ষে মোটেই অসঙ্গত নয়, কিন্তু দেবদাসের এই অদ্ভুত যুক্তিতে একদিকে পার্ব্বতী যেমন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে, অন্যদিকে পাঠকের মনও তেমনি খুসীতে ভরে উঠে, দেবদাস চরিত্রের এই সুনিপুণ অঙ্কনপ্রণালী দেখে।

অমূল্যধন নাপিতকে চুল কাটবার direction দিচ্ছে, হরিচরণ অতুলের কোটের দিকে বিস্ময় ও লোভমিশ্রিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, কানাইপটল সিদ্ধেশ্বরীর বিছানার ভাগ নিয়ে ঝগ্‌ড়া কর্‌ছে, গোকুল নিজে ফেল করেও ভাই-এর সাফল্যে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে বেড়াচ্ছে, মেজদার কাছে আর পড়্‌তে হ'বে না এই আনন্দে সেজদা ও যতীনদা আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে, নতুনদাকে র‍্যাপারখানি

দিয়ে নৌকোয় বসে শ্রীকান্ত শীতে কাঁপ্‌ছে—এমনি কত ছোটখাট ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই সব ছেলেগুলি অতিমাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যদিও তারা beckground-এ পড়ে আছে, তবু বইগুলির কথা ভাব্‌তে গেলে এরাও চোখের সাম্‌নে চলাফেরা করে এবং তৃপ্তি দেয়—এদের সম্পূর্ণরূপে ভুলে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

পরিশেষে একথাও বলি, শরৎচন্দ্র যদি এতগুলি শিশুচরিত্র না এঁকে, একমাত্র 'রামের সুমতি' লিখ্‌তেন, তা' হ'লেও তাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিশুচরিত্র-শিল্পী বলে অভিনন্দিত করতে আমার একটুও বাধ্‌তো না। কয়েকটি সাধারণ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রামের চরিত্রটি যে সুসম্পূর্ণতা লাভ ক'রেছে সাহিত্য-জগতে তার তুলনা মেলা দুরূহ।

শরৎ-সাহিত্যের আভাস

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

শরৎচন্দ্র আজ জীবনের ষষ্ঠপঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিলেন; বাঙলা দেশ ও বাঙলা-সাহিত্যের পক্ষে ইহা পরম কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কথা। কমল-বনের সরস্বতী তাঁহাকে আরো সুদীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিয়া আরো নূতনতর সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করুন, এই প্রার্থনা করি।

. বাঙলা-সাহিত্যের একটি পরম শুভক্ষণে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। এই হিসাবে শরৎচন্দ্র সৌভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। তাঁহাকে উষর ভূমি কাটিয়া জল ঢালিয়া ফসল ফলাইতে হয় নাই; ভূমি তাঁহার জন্য তৈরী হইয়াই ছিল। বঙ্কিম যেমন করিয়া নূতন ভাষা গড়িয়াছেন, এবং বাঙলা ভাষাকে সাহিত্যের আসনে উন্নীত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া বঙ্কিমের ভাষার জড়িমা ঘুচাইয়া তাহাকে সহজ সরল ও সাবলীল করিয়াছেন এবং বাঙালী পাঠকের মনে বিচিত্র রসবোধ ও সৌন্দর্য্যানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকে তেমন কিছু করিতে হয় নাই। শরৎচন্দ্রের জন্য বাঙালী পাঠকসমাজ তৈরী হইয়াই ছিল, কাজেই তিনি যখন নামিলেন, তখন তাঁহাকে কাহারও পরিচয় করাইয়া দিবারও প্রয়োজন হইল না, সহজেই তিনি সকলের মন জুড়িয়া বসিবার সুযোগ পাইলেন। ভাষার জন্যও তাঁহাকে খুব কিছু ভাবিতে বা নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে হইল না—বঙ্কিমের পর রবীন্দ্রনাথ বাঙলা

ভাষার যে রূপদান করিয়াছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ সুখ-দুঃখের কথা ও কাহিনীগুলি সরল করিয়া বলিবার জন্য ভাষার মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি তিনি সঞ্চার করিয়াছেন এবং যে সর্ব্বাঙ্গীন ভঙ্গিমার সন্ধান তিনি দিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাহাকেই পরিপূর্ণ রূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সেই ভাষাকেই নিজের মতন করিয়া গড়িয়া সাজাইয়া সকল নৈবেদ্যের থালায় পরিবেষন করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের বাঙালী-জীবনের বাস্তবতাকে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্‌লা সাহিত্যের যে-দিক্‌টা তিনি কমলগুচ্ছে সাজাইয়াছেন, তাহার রস-সমৃদ্ধির তুলনা পাওয়া কঠিন। আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে যে এত মাধুর্য্য তাহা কে কবে জানিত, এমন রসানুভূতির দৃষ্টি লইয়া কে কবে আমাদের জীবনের দিকে তাকাইয়াছিলাম? আমাদের সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তো আমাদের চিরকালের পরিচয়, তাহার সুখ-দুঃখ তো আমরা প্রতিদিন ভোগ করি, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন নিবিড় রসানুভূতির সঞ্চার যে সম্ভব, সুখদুঃখের মাধুর্য্য যে এত বেশী তাহা কি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম, না, আমাদের মনের অনুভূতির অলিগলি যে এত সূক্ষ্ম ও জটিল সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল? বস্তুতঃ, উপন্যাসের বাস্তব ঘটনাপর্য্যায়ের মধ্যে এমন তীব্র হৃদয়াবেগের সঞ্চার, এমনি সুতীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রেরণা এবং সর্ব্বোপরি কি চরিত্র, কি ঘটনাবস্তু সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ভাবের মোহে ও ভাষার জালে এমন মাদকতার সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের আগে বাঙ্‌লা-সাহিত্যে আমরা কমই দেখিয়াছি।

শরৎচন্দ্রই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম না হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি ও সাহসে আমাদের চিত্তের খেয়াল ও সংস্কারকে, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলাকে সাহিত্যের আসরে টানিয়া নামাইলেন, এবং আমাদের জীবনের অনেক গোপন অলিগলির লজ্জা ও দৈন্য ঘুচাইলেন।

শরৎচন্দ্রের কথা বলিবার ভঙ্গীটিও সুন্দর ও মধুর, খুব সহজ (direct) সরল (sincere) ও স্বাভাবিক। তাহার একটী লঘুগতি আছে, কিন্তু তাহা চপল ও চটুল নহে। দু'জনার কথাবার্ত্তা যেখানে, সেখানেও বলিবার ভঙ্গী বুদ্ধি ও অনুভূতিতে উজ্জ্বল ও সরস, কিন্তু তীব্র ও প্রখর নহে। কথাবার্ত্তার মধ্যে উজ্জ্বল হাস্যরসের কিছু প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু সরস রসিকতার লঘু হাসির আনন্দ আছে, এবং তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনার ভঙ্গীটিও খুব অভিনব ; এমন ঘরোয়া অথচ এমন সরল ও সরস করিয়া ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনা করিবার শক্তি খুব সহজ শক্তি নয়। এই কথার ভঙ্গী, এই বর্ণনার ভঙ্গী, ভাষার সহজ লঘুগতি, শব্দের সহজ অনাড়ম্বর সব কিছু লইয়া তাহার যে 'ষ্টাইল' সে যেন এক নূতন সৃষ্টি, নূতন রূপ।

শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক। জীবনের বিচিত্র বাস্তবতা লইয়া উপন্যাস ; তাহার বিচিত্র ঘটনাপর্য্যায়ের তন্তুজাল বুনিয়া বুনিয়া তবে উপন্যাসের রসসৃষ্টি। সেইজন্য ঔপন্যাসিক যিনি, জীবনের প্রত্যেক চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাকে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেই হইবে ; জীবনের সঙ্গে বিচ্যুত হইলে চলিবে না। শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে কোথাও জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করেন নাই, একান্তভাবেই তাহাকে

মানিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এই বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগও যথেষ্ট হইয়াছে। যে চরিত্রগুলিকে তিনি তাঁহার উপন্যাসে অমরত্ব দান করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছে। কৈশোরের ইন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ় বয়সের জীবানন্দ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার অপরিচিত নয়। চরিত্র ছাড়া, যে সব প্রশ্ন ও সমস্যা তাঁহার বিষয়বস্তুর তন্তু বুনিয়া তুলিয়াছে, তাহারাও তাঁহার একান্ত পরিচিত। জীবনের নানান্ ক্ষেত্রে নানান্ ভাবে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহার ফলে লাভ হইয়াছে এই যে তাঁহার প্রায় সব সৃষ্টিই আমাদের বাস্তব জীবনের কাছে অধিকতর সত্য, এবং আমাদের অনুভূতির নিকটতর ও সেই হেতু প্রিয়তর। তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং মনের বিচিত্র তরঙ্গলীলা আমাদের একান্ত পরিচিত; শরৎচন্দ্র এই পরিচিত রাজ্যকেই সরস ও বিচিত্রভাবে চিত্রিত করিয়াছেন সেইজন্যেই তাহারা এত সহজে আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে, এবং সহজেই পাঠক তাহাদের রসবোধে সমর্থ হয়।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সকল বস্তুর এক অখণ্ড রসপরিণাম স্বীকার করে না; তাঁহার অনুভূতি কখনও বস্তুকে ছাড়াইয়া রসের ঊর্দ্ধলোকে, ভাবের কল্পজগতে বিচরণ করে না। তাঁহার মনের মধ্যে মানুষের সুখদুঃখের অনুভূতি নির্দ্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি ও অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া জাগিয়া থাকে—বস্তুকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে না। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সেইজন্য

আমাদের জীবনের সীমাবদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে তার একান্ত সত্য সুখদুঃখকেই খুঁজিয়াছে, এবং তাহাকেই একান্ত নিবিড় করিয়া একান্ত আত্মগত করিয়া অনুভব করিয়াছে। পৃথিবীর ধূলোমাটির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, প্রকৃতির বিচিত্রতার দিকেও নয়—মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে ইহাদের তিনি বাঁধিতে যান নাই, সেদিকে তাঁহার কল্পনা প্রসারিত হয় নাই। তাঁহার কল্পনা একেবারে ভাবগত নহে, একান্তভাবে অনুভবগত। সহানুভূতি দিয়াই সকলের দুঃখের তিনি পরিমাণ করিতে চাহিয়াছেন, নিজের ভাবের দ্বারা তাহাকে ব্যাপক করিয়া দেখেন নাই।

শরৎচন্দ্র জীবনকে দেখিয়াছেন আমাদের পরিবার ও সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া—যে জীবন একই সঙ্গে ত্যাগে উজ্জ্বল ও স্বার্থে পীড়িত, অনুভূতিতে গভীর ও শাসন সংস্কারে ক্লিষ্ট। তিনি দেখিয়াছেন আমাদের পরিবারে ও সমাজে অত্যাচার ও ব্যাভিচারের লীলা, দুঃখ ও দৈন্যের নিষ্করুণ উৎপীড়ন, বিধি-নিষেধের যুক্তিহীন নির্য্যাতন, এবং আমাদের ব্যক্তিজীবনে এই নির্য্যাতন, অত্যাচারের ও উৎপীড়নের সীমাহীন দুঃখ ও ক্রন্দন। যতটুকু তিনি দেখিয়াছেন খুব নিবিড় করিয়া খুব গভীর করিয়াই দেখিয়াছেন—সে দৃষ্টির গভীরতার তুলনা নাই। আমাদের এই বাস্তব জীবনের দুঃখবেদনার মধ্যেই তাহার কল্পনার যত প্রসার। এই দুঃখ বেদনাকে তিনি নিজের মনের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গভীরতা যেখানে যতটুকু দুঃখ বেদনার পরিমাপ করিতে পারিয়াছে, সেখানে ততটুকু তাঁহার কল্পনা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

বাস্তব জীবনের অজ্ঞাত কল্পনানুভূতির সুগভীর জগতটীর মধ্যে শরৎচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, এবং আমাদের সহানুভূতির মধ্যে তাঁহার আসন পাতিয়া দিলেন। অপূর্ব্ব রসে ও আবেগে আমাদের সমাজ ও পরিবার-বদ্ধ দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব রূপটি আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হইল। দুঃখে ও বেদনায় তিনি ব্যথিত হইলেন, বিধি-নিষেধের উৎপীড়নে পীড়িত হইলেন—তাহাদের লইয়া চিন্তাও হয়ত করিলেন, কিন্তু তাহার মূল অথবা মীমাংসার কিছু খুঁজিতে গেলেন না; তাহাদের লইয়া কিছু বিচার করিতে বসিলেন না। ভালই করিলেন, দুঃখের বিচার অথবা মীমাংসা যে আমরা পাইলাম না তাহাতেই তো দুঃখের বেদনা আমাদের কাছে গভীর হইয়া উঠিতে পারিল—তিনি দুঃখের স্বরূপটিকে আমাদের কাছে ধরিয়া দিলেন মাত্র। রমেশ যে সমাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইল, রমা-রমেশ হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম বহন করিয়া সামাজিক বিধিনিষেধের বশে প্রেমের সার্থকতা পাইল না—ইহার দুঃখের স্বরূপটিকেই শরৎচন্দ্র আমাদের দেখাইলেন, সামাজিক অনুশাসনের কিছু বিচার তিনি করিলেন না, কিংবা তাহার মীমাংসা করিয়া দু'জনকে একত্র মিলিত করিয়া দিলেন না। সেইজন্যেই আমাদের সহানুভূতির মধ্যে তাহাদের দুঃখ-বেদনা নিবিড় হইয়া উঠিল, তাহারা আমাদের হৃদয়ের নিকটতর হইল—এবং সাহিত্য হিসাবে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি সার্থক হইল। সাবিত্রীকে, অন্নদাদিদিকে তো দেখিলাম—আমাদের সমাজ যে কি করিয়া তাহাদের ললাটে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া দিয়াছে তাহাও দেখিলাম কিন্তু কোথাও দেখিলাম না তাহারা অথবা শরৎচন্দ্রের লেখনী সমাজের

এই নিষ্ঠুর বিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, অথবা তাহার একটা মীমাংসা করিল। কিন্তু তাহাদের চরিত্রের বাস্তব রূপটি এমন করিয়া আবেগে, এমন সহানুভূতিতে আমাদের কাছে চিত্রিত হইল যে তাহাদের সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র রহিল না এবং তাহাদের জীবনের দুঃখ ও উৎপীড়নের উপর দিয়াই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অনন্তকালের জন্য তাহারা বাঁচিয়া রহিল।

শরৎচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম কোন বুদ্ধির বলে নয়, যুক্তির বলে নয়—শুধু হৃদয়াবেগের ও অপূর্ব্ব সহানুভূতির সাহায্যে দৈন্য ও সংস্কারপীড়িত বিধিনিষেধ-নির্য্যাতিত আমাদের বাস্তব জীবনকে আমাদের হৃদয়ের নিকটতর করিয়াছেন। পল্লীসমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া দেনাপাওনা পর্য্যন্ত তাঁহার সব সৃষ্টিতেই আমাদের সমাজের ও পরিবারের নানান্ দুঃখ ও সমস্যার যে বাস্তব রূপ, যে সত্যরূপ—তাহাকে সমগ্রভাবে ফুটাইয়াছেন—কোথাও কিছুকে ক্ষমা করেন নাই। রমেশ-রমার দুঃখে, দেবদাসের দুঃখে আমরা ব্যথিত হই, সহানুভূতিতে হৃদয়ের কাছে তাহাদের টানিয়া লই, কিন্তু যখন ভাবি রমা বিধবা, এবং পার্ব্বতী পরস্ত্রী তখন সংসারবদ্ধ সামাজিক চিত্ত আমাদের সঙ্কুচিত হয়। আমাদের রসবোধ তৃপ্ত হয় কিন্তু আমাদের চিরাচরিত সংস্কারবুদ্ধি তাহার সীমা অতিক্রম করিতে চাহে না। এই দুয়ের সংঘাতে আমাদের সামাজিক মনে একটা কঠোর জিজ্ঞাসা শরৎচন্দ্র জাগাইয়াছেন—তিনি বুদ্ধির মধ্যে জিজ্ঞাসা মীমাংসার সুযোগ আমাদের দেন নাই; সেই জন্যই তাঁহার যত আবেদন সমস্তই আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই।

শরৎচন্দ্র বস্তুর রসকে কোথাও বিকৃত বা রূপান্তরিত করেন নাই।

তবে কি শরৎচন্দ্র রিয়্যালিষ্ট ? আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র রিয়্যালিষ্ট একেবারেই নহেন। রিয়্যালিষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা যাহারা, তাহারা বস্তুর রূপকে হুবহু তার বাস্তবরূপেই দেখাইয়া থাকে, সে রূপের সঙ্গে তাহাদের আবেগ, অনুভূতি অথবা কল্পনা মিশাইয়া থাকে না। তাঁহারা বাস্তব-জীবনের ফটোগ্রাফার, আর্টিষ্ট নহেন। শরৎচন্দ্র বাস্তবজীবনের অবিকল ছবি আঁকিয়া চোখের সম্মুখে ধরেন নাই—সে ছবিকে তিনি হৃদয়ের রক্তে রাঙাইয়াছেন, আবেগে তাহাকে কম্পিত করিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি তাহাকে কল্পনানুভূতিতে রস-পরিপ্লুত করিয়াছেন।

শেষপ্রশ্ন

লতিকা বসু

শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রগতির উপাসক সংস্কার-মুক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, আবার প্রাচীন পন্থী রক্ষণশীলদল সুতীব্র ঘৃণায় ইহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন।

এই বইখানি মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই কমল-ই ইহার মূল চরিত্র—তাহাকে ঘিরিয়াই শেষ-প্রশ্নের সমস্ত প্রশ্ন, সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম দর্শনেই কমল সকলকে অবাক্ করিয়া দেয়—এমন কি সাজাহানের অতুলনীয় কীর্ত্তি 'তাজ'ও তার কাছে ম্লান হইয়া যায়। শুধু পাঠকের নয়, পুস্তক বর্ণিত চরিত্রগুলির সকলের দৃষ্টিই আগাগোড়া তার উপর আবদ্ধ। কমল—এই শিশির-সিক্ত পদ্মফুলটী সকলের মন এক পরম অসন্তোষে ভরিয়া দিয়াও এক সীমাহীন বিস্ময়ে সকলকে অভিভূত করিয়া রাখে। তারপর জানিতে পারি তার জন্মের ইতিহাস—তার বাবা কোনও চা-বাগানের বড় সাহেব, মা আমাদের দেশেরই একজন মেয়ে। কমল তার মা'র সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছে 'মা'র রূপ ছিল কিন্তু রুচি ছিল না।' যে পঙ্কিলতার ভিতর তার জন্ম, যে পাপকে আশ্রয় করিয়া সে এ পৃথিবীর আলো বাতাসে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে তারই সম্বন্ধে তার কি নির্ভীক স্বীকারোক্তি। ইংরাজদের মতে তার বাবার

মনটা ছিল "pagan", আমাদের মতে "unmoral". "Unmoral" ও "immoral" কথা দুইটার অর্থ এক নয়—অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁদের চিত্ত ভয়শূন্য, জ্ঞান মুক্ত, বিবেক স্বচ্ছ, চিরাচরিত প্রথার প্রাচে যাঁহারা দাসখত লিখিয়া দেন নাই। তাঁদের কাছে পবিত্রতা শুধু মানব-মনের বহুযুগের অভ্যাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, গভীর তন্দ্রাভিভূত জড় হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। স্বভাবজাত কোন মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্য তাঁহারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই—জ্ঞানের আলোকে তাঁহারা সত্যের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন, মিথ্যা-কুসংস্কারে এই সত্যানুসন্ধানীদের দৃষ্টি অন্ধ হইয়া যায় নাই। জীবনের যে কয়টা বৎসরে মানুষের মনের উপর গভীর রেখাপাত হয়, কমলের সেই কয়টা বৎসর এই রকম এটা আবহাওয়ার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে—এবংবিধ ভাবধারা ও চিত্তবৃত্তি তার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর কমল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কারণ কমলকে বুঝিতে হইলে তাহার জন্ম, তাহার শিক্ষাদীক্ষা, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। কমল তাহার জীবনের উনিশটা বৎসর কাটাইয়াছে চা বাগানে যেখানে, সামাজিক বা নৈতিক প্রথা বলিয়া কোন জিনিষ নাই—যদিই বা কিছু থাকে তাহা না মানিয়া চলাই সেখানকার ধর্ম্ম। সে তার চারিদিকে দেখিয়াছে পশুশক্তির উন্মাদলীলা, বর্ব্বতার অপ্রতিহত প্রভাব—মানুষের উপর কোন মানুষের অত্যাচারের অবিশ্রান্ত ইতিহাস। কমলের সহজ সরল বিচার বুদ্ধি, তার অপূর্ব্ব

সংযম—তার পিতার দান, তাহার সুপণ্ডিত পিতার শুভাশীষ! আর সংস্কারবিহীন চিত্তবৃত্তি, তাহার চরিত্রের কঠোর দিক্ যাহা নিরন্তর আমাদিগকে আঘাতের পর আঘাত করে—এ সকলই তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। কমল শিক্ষিতা নারীর প্রতীক নয়, গ্রন্থকার তাহাকে সে ভাবে চিত্রিত করেন নাই। মনোরমা, মালিনী ও বেলার মধ্যেই আমাদের সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত ও প্রগতিপ্রাপ্ত নারীর ছবি ফুটিয়া উটিয়াছে। "বেলা" একজন suffragist. স্বীয় নীতিবুদ্ধি অনুসারে সে তার স্বামীকে ডিভোর্স করিয়াছে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছে কিন্তু তারই অর্থে নিজের বিলাসোপকরণ যোগাইতে কোনদিনই সে দ্বিধাবোধ করে নাই। অবশেষে সেই পরিত্যক্ত স্বামীর কাছেই আবার সে ফিরিয়া গিয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও গভীর মানসিক দ্বন্দ্বের নিকট সামাজিক বাধা যে কত অসার তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই মনোরমার চরিত্রে। অজিত ও মনোরমা বর্ত্তমান সমাজের আদর্শ নরনারী—সমাজের নির্দ্দেশকেই তাহারা চরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহার স্বার্থের নিকট নিজের সত্ত্বা তাহারা বিসর্জ্জন দিয়াছে, কিন্তু কমল ও শিবনাথ সমাজের এক নূতন আদর্শ লইয়া দেখা দিয়াছে—সমষ্টির কাছে ব্যষ্টিকে, সমাজের কাছে ব্যক্তিকে তাহারা বিসর্জ্জন দেয় নাই। সমাজের এই নূতন আদর্শের প্রবলতাকে অজিত ও মনোরমা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। কমল ও শিবনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর আজিও মনোরমার পক্ষে প্রাচীন আদর্শকে চরম

সত্য বলিয়া জীবনে বরণ করিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিবনাথ এক নির্ব্বিচার শিল্পীহৃদয়ের অনুপ্রেরণার প্রতীক্—তাহার উচ্ছ্বাস ও তাহার কবি-মনের ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাই সে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহার জন্য যাহারা দুঃখ পায় ও দুঃখ সয় তাহাদের কথা একবারও সে ভাবে না। সে একজন যথার্থ Egoist নিজের art ছাড়া জগতে আর কিছুই সে জানে না—জীবনে একমাত্র তাহাই সে ভালবাসিয়াছে, আর সবই শুধু উপলক্ষ্য। তার Egoismএর জন্য সবচেয়ে দুঃখ পাইয়াছে কমল কিন্তু কোন দিনই কমল তার প্রতি কোনরূপ অবিচার করে নাই। কমল বলিয়াছে, "যেদিন থেকে তাকে সত্যি ক'রে বুঝেছি সেদিন থেকে আমার ক্ষোভ অভিমান মুছে গেছে, জ্বালা নিভেছে। শিবনাথ গুণী শিল্পী, শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথে বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন।...মেয়েরা শুধু উপলক্ষ্য, নইলে ওরা ভালবাসে—কেবল নিজেকে, নিজের মনটাকে দু'ভাগ করে নিয়ে চলে ওদের দুদিনের লীলা তারপর সেটা ফুরোয় ব'লে সুর গলায় ওদের এমন বিচিত্র হ'য়ে বাজে। নইলে বাজতো না, শুকিয়ে জমাট হ'য়ে যেতো।" মনোরমা তাহার সমস্ত সুরুচি ও শালীনতা, তাহার সমস্ত সংস্কার লইয়াও তার Egotistial personalityর মোহ এড়াইতে পারে নাই—তাহার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

কমল একটী আদর্শও নয়, typeও নয় অদূর ভবিষ্যতে যে সমাজ বিপ্লব আরম্ভ হইবে, যাহার প্রচণ্ড আবেগে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ

দিশাহারা হইয়া পড়িবে, হয়তঃ তাহাকেই মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে তাহারই কেন্দ্রীভূত শক্তি হইতেছে এই কমল। সমাজের শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার মত আসিয়া সে সমস্ত ওলোটপালট করিয়া দেয়। 'তাজে'র নীচে সেই প্রদোষ আলোকে সে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা শুধু তার অপূর্ব্ব বিস্ময়-ভরা চরিত্রের প্রথম সূচনা। সেইদিনই আমরা বুঝিতে পারি অদূর ভবিষ্যতে কি বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র লইয়া সকলের সম্মুখে সে উপস্থিত হইবে। সে যেমন আকর্ষণ করে, আবার তেমনই আঘাতও করে। আমাদের মাঝে যে একটা ছন্নছাড়া অসমসাহসিক শিশু ঘুমঘোরে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, যে নিত্য নূতনের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়—তাহাকে সে করে সবলে আকর্ষণ, আর পুরাতনের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও অসীম ভালবাসাকে সে করে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত। আমাদের মন এই নির্ম্মম আঘাতে তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠে। সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের উপর বিভিন্ন রকমে সে তার প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন সে আগ্রা ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন এই গ্রহমণ্ডলের প্রত্যেকের মধ্যে এক আশাতিরিক্ত পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। রক্ষণশীলদলের নেতা অক্ষয় কমলকে আঘাতের পর আঘাত করিয়াও কোন দিন যে পরিতৃপ্ত হয় নাই তার মধ্যেও এক আশাতিরিক্ত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। কমল তার মর্ম্মান্তিক শত্রু কিন্তু কি এক অদৃশ্য, অবোধ্য শক্তির প্রভাবে তাহার কাছেই সে মাথা নত করিয়াছে। কমলের কাছে তাহার

শেষ নিবেদন কি মর্ম্মস্পর্শী! তাহার মতবাদ অক্ষয়কে বশীভূত করিতে পারে নাই কিন্তু চিররহস্যময়ী এই নারীর মোহ এড়াইবার শক্তি তাহার কোথায়?

'শেষ প্রশ্ন' এক সর্ব্ববিজয়িনী সম্রাজ্ঞীর বিজয়গীতি নয় এবং কমলকে ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চিত্রিত করা হয় নাই। সুপ্রাচীন মতবাদ, চিরাচরিত প্রথার মূলে সে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিয়াছে, প্রবল প্রাচীন-পন্থীদিগের শত্রুতাকে উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর সে তার মতের প্রাধান্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? আমাদের সমাজের বুকে কালভৈরবের প্রলয়-নাচন সুরু হইয়াছে, আমাদের সমাজ-সৌধ ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। একটীর পর একটী করিয়া সমাজের বিভিন্ন অংশ খসিয়া পড়িতেছে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কোথাও তো কোন নূতন সমাজসৌধ গড়িয়া উঠিতেছে না? নবীনের শুভ আহ্বানে কোন নূতন সমাজ কি রূপগ্রহণ করিতেছে? 'শেষ প্রশ্ন' শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্নই রহিয়া গিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে এই নূতন ভাবধারা, সমাজের এই নবীনতম আদর্শ প্রাচীন রীতি-নীতির সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া এক পরম মঙ্গলময় আদর্শ সমাজের সৃষ্টি করিবে কি না? কমল কি চিরদিনই একটা প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার মত শুধু অশান্তি ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া বেড়াইবে, শুধু দিনের পর দিন চিরাচরিত রীতিনীতিকে আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইবে? সে কি কোনদিনই একটী আদর্শ সমাজের সৃষ্টি করিতে পারিবে না?

কমলের সমস্ত মতবাদ-ই সহজ-বিচার-বুদ্ধি-প্রসূত—কোন

আদর্শকেই গ্রহণ করিতে সে রাজী নয়, একনিষ্ঠতার কোন মূল্যই কোনাদিন সে দেয় নাই। একবার ভালবাসিয়াছে বলিয়া আর কোনদিনই কেহ ভালবাসিতে পারিবে না ইহা শুধু জড়ত্বের পরিচায়ক, মনোবৃত্তির এই নিশ্চলতা সুন্দরও নয়, স্বাস্থ্যকরও নয়। কমল শিবনাথকে সত্যই ভালবাসিত কিন্তু সে যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন তাহার উপর কোন বিদ্বেষ-ই কমলের ছিল না। কোন স্থায়িত্বের উপর তাহার বিশ্বাস নাই। আনন্দের ছোট ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে তাহার মণিমাণিক্যের মত সঞ্চিত হইয়া ছিল। চিত্তদাহে পুড়িয়া তাদের সে ছাই করে নাই। ভালবাসার আয়ু ফুরাইলে আক্ষেপ ও অভিযোগের ধুঁয়ায় আকাশ কালো করিরা দিবার কোনদিন তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এই পর্য্যন্ত কমলকে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু যখন সে অজিতকে লইয়া তার সঙ্গে জীবনযাপন করিবার জন্য চলিয়া যায় তখন তাহার জন্য একবিন্দু সহানুভূতিও আমাদের ভিতর খুঁজিয়া পাই না কেন? সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রেমের chivalrous ideal আমাদের সমস্ত চিন্তাধারা ও চিত্তবৃত্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া আসিয়াছে একজন সঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াই জীবনপথে আমাদের বলিতে হইবে সমাজের এই আদর্শ আমাদের অস্থিমজ্জায় এক সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে তাই কমলের আনন্দময় pagan মনোবৃত্তি Epicurean philosophy ও তাহার Rationalism আমাদের নির্ম্মমভাবে আঘাত করে। অন্ধপ্রথা ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে কোনদিন সে মানিয়া চলে নাই— এই অচল আচার অনুষ্ঠানকে আঘাত করিয়া সচল করাই ছিল তার

জীবনের এক মহান্ উদ্দেশ্য। পুরাতন মাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে মনে করিয়া লইতে হইবে, লৌকিক আচার অনুষ্ঠানই হউক বা পারলৌকিক ধর্ম্মকর্ম্মই হউক কেবলমাত্র দেশের বলিয়াই তাহা আঁকড়িয়া থাকিতে হইবে এই প্রকার মনোবৃত্তিকে সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়াই ঘৃণা করিত। সতী স্ত্রীর কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে লইয়া গণিকালয়ে গমন, স্বামীর লালসার যূপকাষ্ঠে স্ত্রীর আত্মবলিদান— সতীত্বের এই আদর্শের একদিন হয়তো তুলনা ছিল না। কিন্তু কমলের কাছে ইহা শুধু ঘৃণারই উদ্রেক করে। আতিথেয়তার মহান্ আদর্শ রক্ষা করিবার নিমিত্ত দাতাকর্ণ একদিন নিজহস্তে পুত্রহত্যা করিয়াছিলেন ইহা তাহার কাছে বর্ব্বরতা বই আর কিছুই নয়। সে ইহাদের আদর্শের দিক্ বিচার করে নাই, বিচার করিয়াছে ইহার বাস্তবতার নগ্নরূপ। সে বলিতে চায় এই আদর্শের দোহাই দিয়াই মানুষ যথেচ্ছাচার করিয়াছে—এই আদর্শই হইয়াছে তাদের পীড়নের প্রধান অস্ত্র। জগতের সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্রীকে রূপে রসে পূর্ণ করিয়া তুলিবার প্রাণবন্ত শক্তিকে এই আদর্শই করিয়াছে হত্যা। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম তাহার কাছে অর্থহীন— জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের স্বাদ কোনদিনই যাহারা পায় নাই, ত্যাগ করিবে কি প্রকারে? তাহাদের এই সংযম, এই যোগাভ্যাস শুধু ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যাহারা নিজেদের কৃতিত্বের গর্ব্বে মগ্ন হইয়া এই সমস্ত কিশোরদের অনুরূপ জীবনযাত্রায় প্ররোচিত করিয়াছে, তাহারাই মানব ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত অত্যাচারী। পরায়ত্ত, মনগড়া অন্যায় বোধের দ্বারা সমস্ত মন তাহাদের শঙ্কায় ত্রস্ত,

শাসনের চাপে স্বাধীনচিন্তাও তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারা পাইয়াছে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পাইয়াছে অনধিকার, পাইয়াছে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। এই প্রকার পঙ্গু, সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির দ্বারা কোন দিনই কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না, কোন মহৎ ত্যাগের সামর্থ্যও অর্জ্জিত হইতে পারে না।

দেশের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—দুঃখকে মানুষ আর তাহার জীবনে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ অদৃষ্ট অথবা সমাজকে আর উচ্চ স্থান দিবে না। সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, প্রাণবস্তুরূপ আমাদের নিজস্ব জিনিষ, যেমন করিয়াই হউক আমরা তাহা উপভোগ করিবই, ইহাই হইবে বর্ত্তমানের মূলমন্ত্র। বঞ্চিতের মূক বেদনার কালিমালিপ্ত ইতিহাস একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন বই আর কিছুই মনে হইবে না। এই নূতন মনোবৃত্তি আজ সর্ব্বত্র প্রকটিত। সমাজের এই নূতনরূপ দেখিয়া সকলেই আজ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'শেষপ্রশ্নে' কমলের ভিতর ইহা যেমন কেন্দ্রীভূত হইয়া দেখা দিয়াছে, এমন কেন্দ্রীভুত রূপ আর কোথাও দেখা যায় না সত্য, কিন্তু জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই এই মনোবৃত্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। বিধবা আর তাহার বৈধব্যের আত্মনিগ্রহকে অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিতে তরুণীর দাবী, অবাধ মেলামেশার জন্য তরুণের আকাঙ্খা, যে কোন প্রকার শাসন অথবা স্বাধীন প্রবৃত্তির গতিরোধ করিবার প্রচেষ্টার প্রতি তাহাদের অন্তঃহীন উষ্মা এই নূতন মনোবৃত্তির ফল। আমেরিকার তরুণদের বিদ্রোহ, আমেরিকা ও জার্ম্মানীতে youth ও nature

movement ইহারই রূপান্তর। বাঙ্গালীজীবনে এই যে ধ্বংসের লীলা চলিয়াছে আমার মনে হয় তাহারই একটী দৃশ্য শরৎচন্দ্র তাঁহার 'শেষ-প্রশ্নে' অঙ্কিত করিয়াছেন।

শেষপ্রশ্নের বিরুদ্ধে দুইটী অভিযোগ শোনা যায়। প্রথমটী হইতেছে যে স্থানে অস্থানে কমলের সুদীর্ঘ বক্তৃতা পুস্তকখানির রস রচনার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিয়াছে। অবশ্য শেষপ্রশ্নকে যদি আমরা 'শ্রীকান্ত' 'পল্লী-সমাজ' প্রভৃতির সঙ্গে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বিচার করিতে যাই তবে এ অভিযোগ যে অনেকাংশে সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক ও আলাপ আলোচনায় পুস্তক-খানির dramatic ও Narrative possibilitiesএর যথেষ্ট ব্যাহাত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেহেতু শরৎচন্দ্র রসাত্মক গল্প লিখিয়াছেন এবং তাঁহার অমর লেখনীর অপূর্ব্ব লীলা কৌশলে কতকগুলি সজীব চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু তিনি নূতন ভাবের সাহিত্য রচনা করিতে পারিবেন না এমন কথা বলা সমীচীন নহে। শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে চাওয়ার মত অসম্ভব ব্যপার আর কিছু হইতে পারে না।

আজ বাংলাদেশে ও বাঙ্গালী জীবনে যে কয়েকটী সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই নিখুঁত ছবি শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্নে'। আর সেই সমস্যাগুলি প্রবন্ধাকারে না লিখিয়া তিনি রস-সাহিত্যের মূর্ত্তিতে বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচিত করিয়া দিয়া আমাদের অধিকতর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগটী এই যে, শেষপ্রশ্নে আলোচিত কোন কথাই

মৌলিক নয়। একথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে শরৎচন্দ্র নিজেও হয়ত কখনও ভাবেন নাই যে তিনি জগতে কোন নূতন ভাব বা নূতন আদর্শ প্রচার করিতেছেন। ভবিষ্যদ্বক্তা বা দিব্যদ্রষ্টারূপে তিনি শেষপ্রশ্নে দেখা দেন নাই। এখানে দেখিতে পাই তাঁর শিল্পীমনের নির্লিপ্ততা, তাঁর এক নির্ব্বিকার মনোভাব। বাংলায় তিনি এক সমাজবিপ্লবের সূচনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সেই বিদ্রোহন্মুখ শক্তি-রূপেই তিনি কমলকে চিত্রিত করিয়াছেন আর এই নূতন ভাবাধারাকে যাহারা আক্রমণ করিবে সেই বিরুদ্ধ সমাজশক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রে। কিন্তু ইহার শেষ পরিণতি কোথায়? কমল কি শুধু একটা দমকা হাওয়ার মত সকলকে সচকিত করিয়া দিয়াই চলিয়া যাইবে, না সে সঙ্গে করিয়া আনিবে এক মহা বিপ্লবের বীজ যাহা হইতে একদিন এক মহাজাতির জীবন প্রভাতের সূত্রপাত হইবে? 'শেষপ্রশ্ন' পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটাই আমাদের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। শিল্পী তাঁর শিল্পরচনা শেষ করিয়াছেন কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিবে কে?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিব দূর হ'তে—এই ভেবে ধরিনু লেখনী
নিরানন্দ, ছন্দোহীন ; অকস্মাৎ দুয়ারে কাহার করধ্বনি !
কে আসিল বর্ষাশেষে, ভাদ্রের সংক্রান্তি-লগ্নে,—খুলে দিনু দ্বার,
কি অমৃততরঙ্গিনী ! ভীরু কণ্ঠ উচ্চারিল : "তুমি ? চমৎকার !"
আকাশের দূর চন্দ্র মূর্ত্ত আজি মোর আঁখি-তারকার কাছে,
নাহিক' মহার্ঘ অর্ঘ্য, কবিতা কুণ্ঠিতা অতি—কি বা মোর আছে !
কিছু নাই। অসম্পূর্ণ মাল্য বৃথা। আসিলে মর্ম্মের কাছাকাছি
সন্তর্পণে। "কিছু নাই ?" ফুকারিলে স্নিগ্ধস্বরে : "তাই আসিয়াছি।"
রিক্ততার বিত্ত ল'য়ে দাঁড়াইলে স্বল্প, শীর্ণ, সুমধুর হেসে,
তৃপ্তিকর করস্পর্শে সম্ভাষিলে বন্ধুর মতন ভালোবেসে।
নিভৃত নৈকট্য মাঝে অনন্ত মাধুর্য্যরস,—এত ভালো লাগা,
বন্ধুতায় মিশাইলে সুস্নিগ্ধ সোহাগ যেন সোনায় সোহাগা॥

নভে শুভ্র অভ্রমালা, উড়ে চলে শুক্লপক্ষ চঞ্চল বলাকা,
কাশের কানন-পথে লাজুক বঙ্কিম নদী দিয়াছে গা-ঢাকা
অৰ্দ্ধস্ফুটফেনা ; দূরে কৃষকের কুটিরের কুণ্ঠিত বাতিটি
জ্বলিতেছে ইন্দুপাণ্ডু কিশোরীর হৃদয়ের মত। কা'র চিঠি
পড়িয়াছি, কা'র মন্ত্র মৃত্যুহীন অন্তরে তুলেছে প্রতিধ্বনি,
বল্লরীবেষ্টিত পল্লীপ্রান্তরের পারে কা'র আলাপী চাহনি !

মনে পড়ে প্রিয়াহীন নির্জ্জন নিস্তব্ধ গৃহে নিঃসঙ্গ 'রোহিণী'
নিবিষ্ট রন্ধন কার্য্যে ; তপস্যাবিশীর্ণ-কান্তি কোথা বিরহিনী
সুনির্ভয়া সে-'অভয়া' ? ভালে তা'র জ্বলে নাকি সতীত্ব-সিঁদুর ?
মরণের পরেও কি 'বিরাজের' মুখখানি ম্লান, বিপাণ্ডুর ?
কুলিশ কঠোরব্রতচারিণী অপর্ণা সেই—প্রেমের মন্দিরে
নিত্যকাল কাব্যলক্ষ্মী—ভুলি নাই, ভুলি নাই সে-'রাজলক্ষ্মীরে'।
মানুষেরে দেখিলাম কত বড় অনাত্মীয় দেবতার চেয়ে,
'সাবিত্রী' সে দেবী নয়, মলিনা মমতাময়ী মানুষের মেয়ে।

যিনি ভানু, অমর্ত্ত্য কৃশাণু, তিনি থাকুন সোনার সিংহাসনে
কীর্ত্তিমান। তুমি এস গঙ্গার মাঙ্গল্যপূত বঙ্গের অঙ্গনে,
সন্ধ্যামল্লিকার গন্ধে, ঘনবনবেতসের নিভৃত ছায়ায়,
নম্রমুখী তুলসীর শ্যামশ্রীতে,—এসেছ নদীর গেরুয়ায় !
বঙ্গের মাটির মত সুশীতল চিত্ত তব, তবু অনির্ব্বাণ
জ্বলে সেথা দুঃখ-শিখা, সে-আগুনে নিজেরে করেছ রূপবান।
তোমার সে-প্রশ্ন আজো মর্ম্মে বাজে : "বেঁচে বলো আছ কা'র তরে ?"
সবিস্ময়ে শুনি আজ জীবন মুখর তব তাহারি উত্তরে ॥

শরৎচন্দ্র

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তখনও কৈশোর অতিক্রম করি নাই, ইস্কুলে পড়িতাম, তখন হইতেই গল্প লিখিতে সুরু করি। কেন লিখিতাম জানি না। দুঃখ-দেবতার কৃপাদৃষ্টি অতি শৈশব হইতেই আমার উপর একটুখানি বেশি। কাজেই জীবনের দুঃখময় দিনগুলি যখন আর কোনো প্রকারেই অতিবাহিত হইতে চাহিত না, তখন ভাবিতাম হয়ত একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে দুঃখের কথাগুলি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিলেও বা সে গুরুভার লাঘব হয়—কতকটা নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু পাছে আমার সে-দুঃখকে কেহ উপহাস করে এই ভয়ে কাহারও কাছে কিছু বলিতাম না। সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে আমার সম দুঃখভোগী কেহ ছিলও না। কাজেই একা-একা ঘুরিয়া বেড়াইতাম। অতি শৈশবে মা হারাইয়াছিলাম। ভাবিতাম, মানুষ মরে কেন এবং মরিলেই বা যায় কোথায়? ইহাই ছিল তখনকার দিনে আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।

সহসা একদিন কি যে মনে হইল কে জানে, নিজের জীবনের ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে সাজাইয়া নিজের নামের জায়গায় অন্য একটা কাল্পনিক নাম দিয়া গল্পের আকারে লিখিতে বসিলাম। মন্দ লাগিল না। ভাবিতাম বন্ধু না মিলুক, ভবিষ্যতে মনের মত বান্ধবী যদি মিলে ত' তাহারই হাতে আমার এ খাতাখানি তুলিয়া দিব। জীবনে

আমার ঘটনার আর অন্ত ছিল না। দিনের পর দিন অত্যন্ত সযত্নে পাতার পর পাতা লিখিয়া চলিলাম।

কিন্তু সে লেখা আমার বেশিদিন চলিল না। একদিন ধরা পড়িলাম।

যাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া আমার বিদ্যালাভ চলিতেছিল তাঁহার গৃহিনী আমার মঙ্গল-কামনায় স্বামীকে দিয়া আমায় যৎপরোনাস্তি প্রহার করাইলেন এবং তিনি স্বয়ং একটি দিয়াশালাইএর কাঠি জ্বালাইয়া আমার সে খাতাখানি আমারই চোখের সমুখে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিলেন। সেদিন আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তুটিকে এমনভাবে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া কি নিদারুণ দুঃখভোগ যে করিয়াছিলাম তাহা আমার আজও মনে আছে।

মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গোপনে আবার অমনি একটা খাতা বাঁধিব কিনা তাহাই ভাবিতেছি, এমন দিনে আমার এক সহপাঠী বন্ধু বলিল, 'একখানা নভেল পড়বি ?'

'কেমন নভেল ?'

'খুব ভাল। আমি পড়েছি। দিদি এনেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে। জামাইবাবু দিয়েছে।'

বলিলাম, 'পড়ব।'

শশাঙ্ক বলিল, 'তোকে ভাই আসতে হবে আমার সঙ্গে। দরজায় দাঁড়াবি, আমি লুকিয়ে এনে দেবো।'

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। থানার মাঠে আলো জ্বলিয়াছে। বাড়ী তাহাদের বেশি দূরে নয়।

দরজার সুমুখে আস্তাবল। সেই আস্তাবলের পাশে অন্ধকারে ঠিক চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আনিতে দেরি হইতেছিল। তাহাকেও লুকাইয়া আনিতে হইবে। কাকার কাছে ধরা পড়িলেই মুস্কিল। পাঁচকড়ি দে'র দু'খানি 'ডিটেকটিভ্' তখন শেষ করিয়াছি। একখানা ভারি ভাল লাগিয়াছে, আর একখানা ভাল লাগে নাই। ভাল না লাগিবার কারণ—ডিটেক্‌টিভকে লক্ষ্য করিয়া যতগুলা গুলি ছোঁড়া হয় কোনোটাই তাহার গায়ে লাগে না, কোনোটা বা কানের পাশ দিয়া কোনোটা বা হাতের পাশ দিয়া ফস্ করিয়া পার হইয়া যায়, আর ডিটেকটিভের কোনও গুলিই ফাঁক যায় না—সন্ধান একেবারে অব্যর্থ। এইটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকিয়াছিল, তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম, ও-রকম ডিটেক্‌টিভ হয় ত' পড়িব না।

অনেকক্ষণ পরে শশাঙ্ক আসিয়া চুপি-চুপি একখানি বাঁধানো বই আমার হাতে দিল। বইখানি হাতে পাইবামাত্র সেখানে দাঁড়ানো আর প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কাপড়ের তলায় লুকাইয়া ছুটিয়া একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম। তক্তপোষের উপর পড়িবার বই খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, পুনরায় লক্ষ্মীছেলের মত সেইখানে বসিয়া নভেলখানি আলোর সুমুখে খুলিয়া ধরিলাম। চকচকে মলাট। নাম—'বিন্দুর ছেলে।' বইখানি একবার উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া ভাবিলাম, খাওয়া-দাওয়ার পর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াই পড়িতে বসিব। কিন্তু এক লাইন দু'লাইন করিয়া পড়িতে পড়িতে এমনি মন বসিয়া গেল যে আর

ছাড়িতে পারিলাম না। খাইবার ডাক পড়িল। বলিলাম, 'যাই।' দ্বিতীয়বার যখন ডাকিতে আসিল, আমার এখনও মনে আছে, অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আজ আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করছি, ওদের ভাত খাবার আগে যেন আমাকে ব্যাটার মাথা খেতে হয়।'

এই না শুনিয়া 'কি করলে দিদি!' বলিয়া বিন্দু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

বলিলাম, 'খাব না। অসুখ করেছে।' উহাই যথেষ্ট। সত্যই অসুখ করিয়াছে কিনা এবং কি রকম অসুখ তাহা কেহই দেখিতে আসিবে না জানি। দরজায় খিল বন্ধ করিয়া দিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম গল্পটি শেষ হইয়া গেল। আমার চোখের জল তখনও শুকায় নাই। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার খাতার শোক তখন আমি ভুলিয়া গেছি। পুড়াইয়া দিয়াছে, ভালই হইয়াছে। লিখিতে হইলে এমনি করিয়াই লিখিতে হয়।

তাহার পর দ্বিতীয় গল্প—'রামের সুমতি'। এখনও মনে আছে, ধরিয়া ধরিয়া একটু একটু করিয়া পড়িতে লাগিলাম। ভয় শুধু পাছে তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায়।

গল্প লিখিয়া কেহ যে কাহাকেও এমন করিয়া কাঁদাইতে পারে তাহা জানিতাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে বইএর উপর মাথা রাখিয়া কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। ঘুম যখন

ভাঙিল, দেখি,—সকাল হইয়া গেছে, আমি তেমনি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছি, আর শিয়রের কাছে আলো জ্বলিতেছে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেই যে আমার চোখের জলে পরিচয়ের সুরু, সে পরিচয় অন্তরে আমার আজও তেমনি নিবিড় হইয়া আছে।

সহরে একটি লাইব্রেরি তখন খোলা হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বয়সের ছেলেকে বই দেওয়ার নিয়ম সেখানে ছিল না, নভেল পড়িয়া ছেলেরা পাছে বিগ্‌ড়াইয়া যায় এই ভয়ে। টিফিনের সময় কিছু খাইবার জন্য রোজ দুইটি করিয়া পয়সা পাইতাম। লাইব্রেরির মাসিক চাঁদা চার আনা। টিফিনের ঘণ্টা বাজিলেই দূরে রেল-লাইনের ধারে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে লাগিলাম। আটদিন পরে দেখিলাম চার আনা পয়সা জমিয়াছে। আমাদের গ্রামের একজন ময়রাদের ছোক্‌রা ইস্কুলের কাছেই পানের দোকান করিত। সেদিন পরমানন্দে সেই চার আনা পয়সা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, 'আজ তোমাকে যেতে হবে গোষ্ট, চল।' দু'তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত তাহার খোসামুদি করিতেছিলাম এবং এই অঙ্গীকারে শেষ পর্য্যন্ত সে রাজি হইয়াছিল যে, বইগুলি তাহাকে একবার করিয়া পড়িতে দিতে হইবে। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নামটি মনে আছে ত' গোষ্ট?' গোষ্ট বলিল, 'তা আবার মনে নেই? বই আমি এনে দিলেই ত' হ'লো! চার আনা পয়সা দাম দিয়ে বলব—সুরেন্দ চন্দ টাটুজ্যের বই দাও।' অগত্যা একটি কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া 'শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামটি তাহাকে লিখিয়া দিতে হইল।

লাইব্রেরির দরজার পাশে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। গোষ্ঠ ভেতরে ঢুকিয়া বই চাহিল। লাইব্রেরিয়ান্ এ-খাতা সে-খাতা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া খানিক পরে বলিল, 'না, ও-নামের 'অথার্' নেই। সুরেন ভট্‌চাজের বই নিয়ে যাও। খুব ভাল বই।' গোষ্ঠ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিল। পয়সা চার আনা ফেরত লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

আমাদের সে কয়লা-কুঠির দেশে শরৎচন্দ্র তখনও পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। তখন পাঁচকড়ি দে ও সুরেন ভট্‌চাজের যুগ। তাহার পরেও অনেকবার আমি অনেককে দিয়া শরৎচন্দ্রের বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন কে-ই বা তাঁহার খবর রাখে!

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিলাম কলেজে পড়িবার জন্য। আসিয়াই আমার কাজ হইল শরৎচন্দ্রের বই পড়া। তখন পর্য্যন্ত যতগুলি বই তাঁহার ছাপা হইয়াছিল একে একে সবই পড়িয়া ফেলিলাম। মাস-দুই ধরিয়া কলেজের পড়া একরকম পড়ি নাই বলিলেই হয়। কি আনন্দে যে দিনগুলা আমার কাটিয়াছিল তাহা আমার এখনও মনে আছে, চিরদিন মনে থাকিবে।

শরৎচন্দ্রের উপর শ্রদ্ধায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিল। কি ভাল যে তাঁহাকে বাসিলাম, কত ভালো যে লাগিল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নয়। বইএর মধ্যে বইএর মানুষটিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দুনিয়ার নরনারীকে যিনি এমন করিয়া ভালবাসিলেন, দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত মানবের বেদনাবিদগ্ধ জীবনের কাহিনীকে যিনি মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন, বহুবিচিত্র জীবনের গোপন রহস্যপুরে সহানুভূতিকরুণ একটি মমতাময় তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাঁহার সদাজাগ্রত, সে

ব্যক্তিটি নিজে কেমন, কোথায় তাঁহার দেশ, কি করেন, কোথায় থাকেন জানিবার কৌতূহল দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

নিজের দুঃখকে মানুষ চিরকাল বড় করিয়াই দেখে। ভাবিতাম শরৎচন্দ্রও আশৈশব ঠিক আমারই মত দুঃখভোগ করিয়াছেন। তাই কখনও 'রামের সুমতি'র রামের মধ্যে, কখনও দেবদাসের মধ্যে কখনও শ্রীকান্তের মধ্যে, কখনও জীবানন্দের মধ্যে—তাঁহার সন্ধান করিয়া ফিরিতাম।

নানাজনের মুখে নানা গুজব শুনিতাম। কেহ বলিত, লোকটা পাগল, কেহ বলিত অদ্ভুত, কেহ বলিত আরও-কিছু। কখনও শুনিতাম মানুষটি বর্ম্মামুলুক হইতে আসিয়াছেন—বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, সঙ্গে সর্ব্বদা একপাল কুকুর থাকে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন, মুখে একমুখ দাড়ি, চুলগুলা বড় বড়, মাথায় পাগড়ী বাঁধা।

অন্নদাদিদি যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সাপুড়ে সাহ-জির সঙ্গে মনে-মনে মিলাইয়া দেখিতাম। ভাবিতাম এমন অদ্ভুত মানুষ যখন, তখন সাপ তিনি নিশ্চয়ই ধরিতে পারেন।

কখনই কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না?

শুনিতাম, তিনি শিবপুরে থাকেন।

আবার এক-এক সময় ভাবিতাম, থাক্, আর দেখিয়া কাজ নাই। যাহা শুনিয়াছি হয়ত সবই ভুল, সবই মিথ্যা, হয়ত তিনি ঠিক আমাদেরই মত মানুষ। এ ভুল ভাঙিবার কোনও প্রয়োজন নাই,

আমার অন্তরের সেই অপরূপ শরৎচন্দ্র বিধাতার মত রহস্যময় হইয়াই থাকুন!

সাহিত্যকে আশৈশব ভালবাসিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কে জানিত সাহিত্যই একদিন আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিবে, কে জানিত শরৎচন্দ্রকে একদিন দেখিতে পাইব! এবং শুধু দেখিতে পাওয়া নয়, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় যে আমার একদিন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইব সে ধারণা কোনো দিন করিতে পারি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে উদ্ভট গুজব আজ আমার কাছে মিথ্যা হইয়া গেছে। বাংলার মাটির মত স্নেহপ্রবণ সহজ সুন্দর একটি মানুষ! স্নিগ্ধ শান্ত তাঁহার সে দুটি আয়ত চক্ষের সুগভীর দৃষ্টির মধ্যে একটি অতলস্পর্শী রহস্য লুকানো, তাঁহার সে প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখচ্ছবি একবার দেখিলে সহজে আর তাহা ভুলিবার উপায় নাই। স্নেহ-বঞ্চিত বুভুক্ষু অন্তর, রিক্ত রুক্ষ তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসী, আকাশের মত উদার, বিধাতার মত উদাসীন!

আজ ভাদ্র-সংক্রান্তি। শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি। দেশবাসী আজ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে, শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। এমনি কত ভাদ্রের কত সংক্রান্তি যে তাঁহার পথে-প্রান্তরে কাটিয়াছে কে জানে, গৃহহীন স্নেহহীন স্বজনবান্ধবহীন শিল্পী হয়ত বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অবহেলিত উপেক্ষিত অবস্থায় বহু জন্মতিথিতে পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিয়াছেন। কেহ তখন একটিবার ফিরিয়াও চাহে নাই। আজ এতদিন পরে যে তাহাদের সে-শুভবুদ্ধি জাগ্রত

হইয়াছে তাহার জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ! যাহাদের জন্য তিনি বিষপান করিয়া অমৃতের তপস্যা করিলেন আজ তাঁহাকে বাঁচাইবার প্রয়োজন যে তাহারাই অনুভব করিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। দেশবাসীর আজ এই শ্রদ্ধা-সম্মান এই আদর-অভ্যর্থনা শরৎচন্দ্রের দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রু আনিবে তাহা জানি, কিন্তু তবু ইহার একান্ত প্রয়োজন।

নিজের তরফ হইতে বলিবার আর কিই-বা আছে! যাঁহাকে দিনের পর দিন পূজা করিয়াছি, তাঁহাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা যদি আজ কাগজে কলমে লিখিয়া নিবেদন করিতে হয় ত' তাহার চেয়ে বিড়ম্বনা বোধকরি আর কোথাও কিছুই নাই। অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা-নিবেদনের ভাষা আমার অজ্ঞাত। ভাষা যেখানে মূক, হৃদয় যেখানে পরিপূর্ণ আনন্দে স্তব্ধ, গোপন অন্তঃস্থলের সেই নিভৃত নীরব জ্যোতির্ম্মঞ্চে আমাদের অগ্রজ শিল্পী এই শরৎচন্দ্রের সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি। প্রকাশকুণ্ঠ ভাষা যদি আজ তাঁহাকে সেখান হইতে টানিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে বাহির করিতে অসমর্থই হইয়া থাকে ত' আশাকরি আমার অন্তর্য্যামী সেজন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

শরৎচন্দ্র

শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায়

সমাজের স্তরে স্তরে জমিয়াছে যত পাপ গ্লান
হিংসা দ্বেষ অত্যাচার, লাঞ্ছিতের বুভুক্ষুচিৎকার,
অনড় জড়ত্ব যত ব্যর্থতায় করে হাহাকার
সবার বিরুদ্ধে তুমি আনিয়াছ তব দৃপ্তবাণী।

দেখায়েছ রমণীরে লালসার পথেও কল্যাণী
প্রাণে থাকে যে নারীত্ব আলো কভু নেভেনাক তার,
সন্ধান পেয়েছ কত পথে-ঘাটে স্নেহের সুধার
এঁকেছ প্রীতির রঙে মহিয়সী নারীমূর্ত্তিখানি।

মরমী লেখক তুমি দরদের অমৃত ছিটায়ে
প্রাত্যহিক জীবনের সব কিছু করেছ অমর,
বাঙালী পড়েছে তাই বানী তব আকাঙ্খামিটায়ে।

সাহিত্য-গগনে তুমি শরতের ফুল্ল শশধর,
যে দেশে বেসেছ ভাল সে বঙ্গের শ্যাম পল্লীছায়ে
আরো কিছুকাল ধরি' বিলাও গো জোতির লহর।

শরৎ-সাহিত্যের নাটকত্ব

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

উপন্যাস-সাহিত্য এবং নাট্যসাহিত্যের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ট। সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ—এই দুই বিভাগীয় সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান ও উপকরণ প্রধানতঃ একই। মানুষের জীবনের কাহিনী, এবং তাহাতে বর্ণিত নরনারীর সুখদুঃখ হইতে একটা স্থায়ী রস সৃষ্টিই নাটক ও উপন্যাস—দুয়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র আকারের পার্থক্য অনুসারে ইহাদের রচনা প্রণালীও সম্পূর্ণ-পৃথক হইয়া দাঁড়ায়। উপন্যাসে গ্রন্থকার নিজে সম্পূর্ণ ব্যক্ত—স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বর্ণিত চরিত্র বুঝাইয়া দেন, রস পরিস্ফুট করেন। নাটকের বেলায় নাট্যকার নিজের সৃজিত চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দিয়া আসর হইতে বিদায় লন। নাট্যকার ঔপন্যাসিকের চেয়ে নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে একটু বেশী উদাসীন। উভয় সাহিত্যের পার্থক্য বস্তু-ভেদে নয় প্রকার-ভেদে।

সাধারণ পেশাদারী রঙ্গালয় (যেখানে প্রতি সপ্তাহে অভিনয় হইয়া থাকে এবং অভিনয়ের জন্য নিত্য নূতন নাটকের আবশ্যক হয়) স্থাপিত হইবার পর নাট্যমঞ্চের নূতন অভিনয়ে নাটকের নিয়মিত সাপ্তাহিক দাবী মিটাইবার জন্য অনেক উপন্যাসকে নাটকের আকারে ঢালিয়া সাজাইতে হইয়াছে। এরূপ প্রথা পাশ্চাত্য দেশে এবং এদেশে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে।

বাংলাদেশে আধুনিক রঙ্গালয় স্থাপিত হইবার পর নাটকের অভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয় হয়। বোধকরি সর্ব্বপ্রথম "দুর্গেশনন্দিনী" অভিনয় হইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসগুলিই নাটকে রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে। এমন কি "কমলাকান্তের দপ্তর" "মুচিরাম গুড়ের জীবনী" ও বাদ যায় নাই। বঙ্কিমের প্রত্যেকখানি গ্রন্থই রঙ্গালয়কে পুষ্ট করিয়াছে—শুধু সাহিত্য-রসের দ্বারা নয় অর্থের দ্বারাও। আজিও "চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল) ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিলে রঙ্গালয়ে দর্শকের অভাব হয় না, "আনন্দ মঠের" কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম। "স্বর্ণলতা"র নাটকীয় সংস্করণ "সরলা"র নাট্যাভিনয় যে জনসাধারণের কত প্রিয়, তা বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু খোঁজখবর রাখেন তাঁহারাই জানেন।

এই সমস্ত উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয়ে যে এত জনপ্রিয় হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ ইহাদের মধ্যে সেই প্রগাঢ় নাট্যরস আছে যাহা পাঠক ও দর্শকের প্রাণকে আকৃষ্ট করে। উৎকৃষ্ট নাটকের যে যে গুণ থাকা দরকার এই সকল উপন্যাসেও সেই সমস্ত গুণ আছে। গ্রন্থে সেই রস এবং কিয়ৎ পরিমাণে সেই রূপ ছিল—তবেই তাহাদের নাট্যরূপ খুলিয়াছে।

শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে তাঁহার হাত একেবারে পাকা ওস্তাদের হাত। সেই ওস্তাদী-হাতের একবারে সুপরিপক্ক রচনা লইয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন। থিয়েটারের

পক্ষ হইতে থিয়েটারের সুবিধার জন্য তাঁহার উপন্যাস অন্য লেখক নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলির ভিতর আজ পর্য্যন্ত মাত্র চারিখানি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়া অভিনয় করা হইয়াছে। "দেনা-পাওনা" উপন্যাস হইতে "ষোড়শী," "পল্লীসমাজ" হইতে "রমা" এবং "বিরাজ-বৌ" ও "চন্দ্রনাথ" নাটকীকৃত হইয়াছে।

ইহার ভিতর ষোড়শী এবং রমার নাট্যরূপ সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথার উল্লেখ করিব। নাটকাকারে এই উপন্যাস দুইখানি অত্যন্ত জনপ্রিয়—এবং ইহাদের (বিশেষতঃ রমার) সবাকচিত্র বাঙ্‌লা সবাকৃচিত্রের দিক দিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বেশ স্মরণ আছে প্রথম যখন "ষোড়শী" অভিনয় হইল, বাংলার সুধী নাট্যরসিকগণ ইহাকে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আধুনিক বাংলার সামাজিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষোড়শীর এই যে নাট্যরূপ ইহা কি নাটকে রূপান্তরিত করিবার সময় বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে—না মোটামুটি উপন্যাসেই এই নাট্যরূপটি ছিল? যাঁহারা "দেনা-পাওনা" এবং "ষোড়শী" মিলাইয়া পড়িবেন তাঁহারা সহজেই দেখিতে পাইবেন একমাত্র অঙ্ক ও দৃশ্যের বিভাগ ছাড়া নাট্য-রচয়িতাকে বিশেষ কোন কষ্ট করিতে হয় নাই। তিনি ইহাতে কোন নূতন চরিত্র সংযোগ করেন নাই উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর কথাবার্ত্তাগুলি একেবারে অবিকৃত ভাবেই নাটকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নরনারীদের এই নাট্যরূপ ছিল।

ষোড়শী নাটক দেখিলে মনে হয় ষোড়শীর সঙ্গে মিলিত হইবার যত কিছু আগ্রহ জীবানন্দের। ষোড়শী উদাসীন! কিন্তু আসলে

ষোড়শী উদাসীন নয়। ষোড়শীর মনে এক প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তার দেবীত্বের সংস্কারে আর পরিপূর্ণ নারীত্বের আকাঙ্ক্ষায়। তারপর নারীত্বেরই জয় হইল, দেবী ষোড়শী মানুষের সংসারে ঘর বাঁধিতে আসিলেন। দেনা পাওনা উপন্যাসে ঘর বাঁধিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ষোড়শী নাটকে সে সুযোগ শরৎবাবু দেন নাই। গ্রীক্ নাটকের নেমেসিসের মত বাহিরের এক অদৃশ্য শক্তি (নিয়তি— যাহার কার্য্যের হিসাব নিকাশ মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না) জীবানন্দ ষোড়শীকে ঘর বাঁধিতে দিল না—মৃত্যু আসিয়া আবার তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিল।

আমার মনে হয় নাটকে জীবানন্দের এই মৃত্যুই অধিকতর উপযোগী হইয়াছে; তাহার কারণ ষোড়শী জীবানন্দের জীবন ঠিক সাধারণ সহজ জীবন নয়—তাহাদের মিলন-বিচ্ছেদের ইতিহাসে এই নেমেসিসের অদৃশ্য হস্তের নিয়োগ সর্ব্বই দেখা যাইতেছে। যে ভাবে উহাদের বিবাহ হইয়াছিল সাধারণ নরনারীর সে ভাবে বিবাহ হয় না। জীবানন্দের চলিয়া যাওয়া, জমিদারী পাওয়া, অলকার ষোড়শী হওয়া, শান্তিকুঞ্জে তাহাদের মিলন—সমস্ত ঘটনাই যেন দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা নয়—ইহাদের প্রত্যেকটিতে কোথায় যেন সেই অঘটন ঘটন-পটীয়সী নিয়তির হাত আছে। সমস্ত ব্যাপারটী গ্রীক্ নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। এবং সেই কারণেই অভিনয়ে ইহা এত ভাল জমে সেকালে শরৎবাবুর বিরুদ্ধে কারো কারো অভিযোগ ছিল—শরৎবাবু আধুনিক এবং সমাজতন্ত্রে বিপ্লববাদী। এ অভিযোগের কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। দেনা পাওনা বা ষোড়শী বিশ্লেষণ করিয়া

আমরা যাহা পাইলাম তাহা আদৌ আধুনিক নহে এবং ইহার মধ্যে সমাজ বিপ্লবের চিহ্নও নাই। শরৎচন্দ্র সনাতনপন্থী। তিনি বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর কবি। দেবী না হইয়া নারীকে মানবী থাকিবার বিধান আমাদের শাস্ত্রই দিয়াছে—"পতিই নারীর গুরু অন্য ধর্ম্ম তার নাই।" এ বিষয়ে বরং বৈষ্ণব-সাহিত্য বিপ্লবের সাহিত্য; তাহাতে সমাজ এবং গৃহ ভাঙার ইঙ্গিত আছে। পতিকে ছাড়িয়া জগৎপতির (শ্রীকৃষ্ণের) উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে।

শরৎবাবু বাস্তব (realistic) চিত্র আঁকিয়া থাকেন—একথা কেহ কেহ বলিয়াছেন। তাঁহার গল্পে বাস্তব চিত্র আশেপাশে থাকিলেও উপন্যাসের মূল সুর ভারতীয় আদর্শবাদ। পল্লীসমাজ বা রমার নাটকত্ব আলোচনা করিলেও আমরা এই সত্যেই উপনীত হইতে পারিব। সংস্কার তাঁহার কামনা; আমূল পরিবর্ত্তন বা একেবারে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গঠনের কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। পল্লীসমাজের রমেশও নূতন সৃষ্টির কোন চেষ্টা করে নাই—রমেশ সংস্কারক। রমেশ যদিও মুসলমানের হাতে জল খায়, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, ষষ্ঠি, শীতলা প্রভৃতি গ্রাম্য দেবীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নাই—তবু সে পিতৃশ্রাদ্ধ করে, জেঠাইমার কথা বেদবাক্য বলিয়া মানে—ভাঙিবার এবং নূতন করিয়া গড়িবার জন্য যে নির্ম্মমতা এবং প্রচণ্ড প্রাণশক্তির আবশ্যক—রমেশের তাহা নাই। শরৎবাবু সংস্কার চাহেন; প্রাচীন হিন্দুসমাজের আমূল পরিবর্ত্তন চাহেন না। তিনি পল্লীসমাজ ভালবাসেন তার সমুদয় দোষগুণ লইয়া। বাঙ্গালা দেশকে এবং এই বাংলার পল্লীসমাজকে তিনি এত ভালবাসিয়াছেন যে

সংস্কারের পথ নির্দ্দেশও প্রায় তাঁর সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছে। এ যেন দুষ্ট ছেলের প্রতি জননীর প্রাণের টান। নানা বাস্তব চিত্র ও চরিত্রের ভিতর হইতে পল্লীসমাজের মূল সুর উঠিয়াছে আদর্শবাদের উচ্চতর লোকের দিকে। হিন্দু গ্রন্থকারের বিশিষ্টতা এইখানেই। তাঁর রমার মন টলিয়াছিল—তাই মরিবার আগে তার চিত্তশুদ্ধির জন্য তাকে কুয়াপুর হইতে টানিয়া লইয়া ৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের পদপ্রান্তে পৌঁছিয়া দিয়াছেন। রমেশও প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধার বশে কোনদিন জোর করিয়া বলিতে পারে নাই—"রমা আমি তোমায় ভালবাসি।" অথচ এই প্রাণের কথাটিই সে মিথ্যা করিয়া অন্য ভাবে বলিয়াছিল—"একদিন তোমায় ভালবাসিতাম—কিন্তু সে রমাও তুমি কোন দিন ছিলে না—সে রমেশও আমি আর নেই।" রমাও যে রমেশকে বার বার আঘাত দিয়াছে—তার ভিতরের কথা "ভাবের ঘরে চুরি।" অন্তরে সে যত রমেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে বাহিরে সে ততই বিমুখ হইবার অভিনয় করিয়াছে। শরৎবাবু যদি আধুনিক হইতেন, বিধবা-বিবাহে যদি তাঁর বিশ্বাস থাকিত, রমা ও রমেশের মিলন করাইয়া হয়তো তাহাদিগকে সুখী করিতেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁহার "সংসার ও সমাজ" উপন্যাসে তাহাই করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বিপ্লবপন্থী নহেন সনাতনপন্থী। সাংসারিক সুখের চেয়ে শান্তিকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ষোড়শীতে মূল নাট্যরসটি যেমন প্রগাঢ় হইয়াছে "রমা"য় তাহা হয় নাই। এখানে মূল রসের চেয়ে পল্লীসমাজই বড় হইয়া দেখা দেয়। তাহার ভিতর রমা-রমেশের প্রণয় খুব বেগবান

নয়—ইহাতে গভীরত্ব আছে কিন্তু হিন্দু আদর্শের পরিপন্থী হওয়াতে নায়ক নায়িকা কাহারো প্রেম প্রচণ্ড স্রোতোশীল হইতে পারে নাই অন্তর্গূঢ় হইয়া আপনাতে আপনি অচঞ্চল রহিয়া গেছে।

শরৎবাবুর প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই এই রকম নাটকীয় রূপ ও রস অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। নাটককারে পরিবর্ত্তন করিয়া এই নাট্য-রূপটি অভিব্যক্ত করিয়া তোলা, নাট্যকৌশল যাঁহারা জানেন এমন লেখকের পক্ষে খুবই সহজ। এই নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও ঘাত প্রতিঘাত আছে—তাঁহার দত্তা, চরিত্রহীন, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিত মশাই, স্বামী, পরিণীতা, কোনখানির নাম করিব—সব গুলিই নাটকাকারে অভিনয় হইবার যোগ্য। অনেকগুলি নির্ব্বাক চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হইয়া গেছে।

বিশদভাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাটকত্ব আলোচনা করিতে হইলে বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়—এই ক্ষুদ্রাকার প্রবন্ধে তাঁহার গ্রন্থের সার্ব্বসৌন্দর্য্য দেখানো সম্ভব নয়। আমি দু'একটি অতি সাধারণ লক্ষণের উল্লেখ করিলাম। পরিশেষে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা—তিনি বহু বৎসর এইভাবে বাঙালী জাতি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হউন এবং মাতৃভাষা ও জাতির সাহিত্যকে নূতন জীবন দান করিয়া জগৎসভায় বরেণ্য করিয়া তুলুন।

শরৎচন্দ্রের প্রতি

শ্রীস্থবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের জড়িমা ছিলো ম্লান দু'টি চোখে ; আর ছিলো
রমার গুঞ্জর-গান পূবালি বায়ুর কানে-কানে !
গঙ্গার সর্ব্বাঙ্গ ভরি' যেন কোন্ কোটালের বানে
তরঙ্গ উচ্ছলি' উঠে !—মুগ্ধ আঁখি কা'রে নিরখিলো !

সহসা শিয়রে মোর নেমে এলো রাত্রির দেবতা !
চন্দন-বনের পথে যে-সুরভি ছিলো দিশাহারা,—
সোনার বাংলার মাঠে, জ্যোৎস্নারূপে ফিরে এলো তা'রা ;
শেফালির বুকে তাই স্তব্ধ হ'য়ে আছে সব কথা !

কাশের মঞ্জরী দশ দূরে কোথা কাঁপে অবিরাম !
যত অশ্রু ছিলো জমা, তোমার মানস-সরোবরে,
হে মরমী শিল্পী, জানি, ফিরে এলো পরম সম্মান,
হাজারো কমল-দলে !—প্রতি ঘরে, ওগো মহাপ্রাণ
কান্না যা'রা রাখে ঢাকি' ম্লান হেসে কম্পিত অধরে—
অর্পিনু এ-গানে মোর, তাহাদের সবারে প্রণাম !

শরৎচন্দ্র

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বয়স তখন অল্প, পাঠ্যপুস্তকের শাসনের ফাঁকে ফাঁকে সবে তখন সাহিত্য-লোকে গোপন অভিসার সুরু হইয়াছে। এমন একদিনে, কেমন করিয়া মনে নাই, একটি মাসিকপত্রিকা আমার জগতে আসিয়া পড়িয়াছিল। মাসিকপত্রিকা তখন আকাশের তারা ও প্রভাতের রৌদ্রের মত বিস্ময়কর বস্তু। মানুষে তাহা নির্ম্মাণ করে, এবং মুদ্রাযন্ত্রে অত্যন্ত সাধারণভাবে তাহা ছাপা হইয়া দপ্তরীর কাছে বাঁধা হইয়া বাজারে বাহির হয় একথা কেহ বলিলে বিশ্বাস করিতাম কি না বলিতে পারি না।

সেই অপরূপ মাসিকপত্রে ততোধিক অপরূপ একটি কাহিনী পড়িয়াছিলাম। লেখকের নাম অবশ্য লক্ষ্য করি নাই—সে বয়সও নয়, কিন্তু আমার কৈশোর জীবনের অনেক দুঃখের ভিতর একটি দুঃখ বড় হইয়া উঠিয়াছিল মনে আছে। কাহিনীটি অসমাপ্ত, মাসিকপত্রটির পরবর্ত্তী সংখ্যাও আর আমার পাইবার সৌভাগ্য হয় নাই। পত্রিকার কয়েকটি পাতায় যে কটি লোকের সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয় হওয়াতেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম—তাহাদের সহিত আর জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না এই শোক আমার কাছে সেদিন চরম হইয়া উঠিয়াছিল। আমার জীবনে চকিতে একবার মাত্র দেখা দিয়াই এই যে কটি অসাধারণ পুরুষ ও নারী নিরুত্তর অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, তাহাদের কথা সত্যই অনেকবার তখন ভাবিয়াছি। পরমাত্মীয়ের বিয়োগব্যথার মতই তাহাদের সহিত বিচ্ছেদের বেদনা সেদিন মনে বাজিয়াছিল।

মাসিকপত্রিকাটির নাম 'যমুনা'। উপন্যাসটির নাম বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

তাহার পর আর একটু বড় হইয়া 'ভারতবর্ষেই' বোধ হয় একটি বইএর বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিলাম। বিজ্ঞাপনের ভাষা ঠিক স্মরণ নাই। তবে তাহার মর্ম্মার্থ এইভাবে প্রকাশ করা যায়—মাসিকপত্রে যাঁহার প্রথম লেখা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথই ছদ্মনামে লিখিতেছেন বলিয়া সাধারণের ধারণা হইয়াছিল সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস—'বিরাজবৌ'।

সাহিত্য-জগতে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব সত্যই অমনি অকল্পিত, বিস্ময়কর। উষার আকাশ রাঙা হইয়া ওঠা হইতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাকাশের শিখরে আরোহণের সমস্ত পর্ব্বই সাধারণের চোখের সামনে ঘটিয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব একেবারে আকস্মিক। আকাশের ঘন মেঘ অপসারিত করিয়া অকস্মাৎ তিনি পূর্ণগৌরবে প্রকাশ হইয়াছেন—পূর্ণিমার চন্দ্রের মতই স্নিগ্ধ মায়া তাঁহার জ্যোতিতে।

শরৎচন্দ্রের মত এমন রহস্যে মণ্ডিত হইয়া আর কোন লেখক বোধ হয় সাহিত্যে প্রবেশ করেন নাই। এখন মনে পড়ে সে কালে সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁহার পরিচয় কি কুহেলিকাতেই আচ্ছন্ন ছিল? কত অদ্ভুত গুজব, কত অসম্ভব গল্পই না তাঁহার সম্বন্ধে তখন শোনা গিয়াছে! সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া এই যে কাহিনীর যাদুকর হঠাৎ এক শুভপ্রভাতে সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে চকিত,

চমৎকৃত করিয়া দিলেন, তাঁহারই সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া মুগ্ধ বাঙ্গালী সেদিন তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে। সতীশ উপীন দা, রমেশ এমনকি দেবদাসের মধ্যেও আমরা সেদিন তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছি। সেই সঙ্গেই তাঁহার ভোলা কুকুরের কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার মধ্যে টাঙ্গান বন্দুকের পাশে রুদ্রাক্ষের মালার কথা, তাঁহার শেল্‌ফে সাজানো অজস্র বিজ্ঞান-গ্রন্থের কথা।

শুনিয়াছিলাম তিনি শিবপুরে থাকেন। শিবপুর তখন শুধু গঙ্গার ওপারে নয় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বলিয়া মনে হইয়াছিল। ঠিকানা বাহির করিয়া তাঁহার বাড়ি খুঁজিবার কথা সেদিন মনেই হয় নাই।

রাতারাতি একটা সমগ্র দেশের হৃদয় জয় করা সত্যই অলৌকিক ব্যাপার। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। তাই কোন্ যাদুমন্ত্রে কি অপূর্ব্ব কৌশলে শরৎচন্দ্র সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াই সকলকে এমন করিয়া বশ করিলেন জানতে ইচ্ছা করে। গল্প উপন্যাস আরও অনেকে লিখিয়াছেন, এবং ভালোই লিখিয়াছেন কিন্তু এত সহজে আর কেহ সাধারণের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশাধিকার পান নাই। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর জন্য এমন কি অপরূপ উপহার আনিয়াছিলেন? সে কি শুধু অশ্রুত-পূর্ব্ব গল্প, শুধু কি অদৃষ্টপূর্ব্ব চরিত্র, শুধু কি লিখিবার অপরূপ ভঙ্গি? শুধু কি মানুষের চরিত্র ও জীবন স্পন্দনে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি; লিখিবার অনুকরণীয় ভঙ্গি মানুষের হৃদয় সহজে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি কিছুরই তাঁহার অভাব নাই কিন্তু তাঁহার গল্প অশ্রুতপূর্ব্ব নয় বা তাঁর চরিত্রগুলিও অদৃষ্টপূর্ব্ব নয়। ইহাদের সকলকেই

আমরা কিছু কিছু চিনি। এই মায়াবী লেখকের অসাধারণ সার্থকতার রহস্য, এই যে আমাদের পরিচিত জনের সহিতই তিনি আমাদের পরিচয় করাইয়াছেন। তাঁহার রচিত রহস্যমুকুরে অকস্মাৎ বাঙ্গলাদেশ তাহার আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছে।

বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ মানুষের সমষ্টি মাত্রই জাতি নয়। রাজনৈতিক ঐক্য, শিল্প-বাণিজ্যের যোগসূত্র এবং বাহ্যিক স্বার্থের বন্ধনেও সত্যকার জাতি গড়িয়া ওঠে না। মানুষের ইতিহাসে সেই জাতির মূল্য আছে, বহু শতাব্দির অভিজ্ঞতায় যে জাতি, জীবনকে গ্রহণ করিবার ও সার্থক করিবার একটি বিশেষ ভঙ্গি একটি বিশেষ দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে, পুঁথির পাতায় ন্যায়শাস্ত্র-শাসিত দর্শন এ নয়। জাতির রক্তের সহিত এ জীবন-দর্শন মিশিয়াছে।

জীবনকে ধন্য করিবার বাঙ্গালী জাতির এমনি একটি অনন্য-সাধারণ ভঙ্গি আছে। না থাকিলে জাতি হিসাবে তাহার কোন সার্থকতাই থাকিত না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র গভীরভাবে তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে ভাষায় রূপ দিলেন। আমাদের হৃদয় মন যাহার অস্পষ্ট ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া তুলিয়াছেন। এখানে তিনি বাঙ্গালার অন্তরলোকের ঋষি।

কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীকে ঋষির মত শুধু দূর হইতে প্রণাম করিয়া আমাদের সুখ নাই। বাঙ্গালা দেশের হৃদয়ে তাঁহার আসন চিরন্তন।

শরৎচন্দ্রের প্রতি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১

তখন যৌবন-দিন, বিকশিত চিত্ত-শতদলে
সুপবিত্র প্রীতিরাগ, পূজ্য-পূজ্য লাগি' সে অধীর,—
সেই কালে—অবারিত ছিল যবে আশীষ বিধির,
সহসা হেরিনু তোমা—পূর্ণচন্দ্র উদয়-অচলে !
সে কি চিত্ত-চমৎকার !—পড়িলাম রুদ্ধ কুতূহলে
সুবিচিত্র কথা সেই 'বিরাজে'র—হৃদয়-রুচির !
সামান্যা সে রমণীর অসামান্য প্রেম-কাহিনীর
অন্তরালে নিখিলের নয়নাশ্রু-উদধি উথলে !
এ বঙ্গের গৃহাঙ্গনে সে কি চিত্র চির-অগোচর
দেখালে দরদী কবি !—বিরহের ঘন-ঘোর নিশা,
বিদ্যুৎ-চকিত দীপ্তি তিমিরে দেখায় তবু দিশা !—
প্রেমের পুরুষ-মূর্ত্তি নীলকণ্ঠ-সম 'নীলাম্বর' !
কুলহীনা রমণীর নেত্রে সেই সন্ধ্যাদীপ-তৃষা,
কলঙ্কিনী-সতী-শোকে পতি তার ধ্যানী মহেশ্বর !

২

কে জানিত তার আগে—সর্ব্বশেষ মন্দির-সোপানে
ধূলায় ধূসর যেই পড়েছিল প্রাণের ভুখারি
একপাশে, অজ্ঞাত অখ্যাত সেই বাণীর পূজারী
জীবজন্ম-রসাতলে ডুবেছিল অমৃত-সন্ধানে !
ঘৃণা ভয় বিসর্জ্জিয়া আকণ্ঠ গরল-ফেন-পানে
লভিল আরেক আঁখি ভস্মলিপ্ত ললাটে তাহারি !
শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা বীরাচারী—
শব-বক্ষে কান পাতি' ধ্বনি তার ধরিতে সে জানে !
তাই তার সাধনায় ভয়ঙ্করী অমা-নিশীথিনী
হাসিল মধুর হাসি, অন্তহীন লাবণ্য-লীলায় !
যা' কিছু কুৎসিত হেয়, তারে তার চিত্ত-প্রবাহিনী
করাইল পুণ্য-স্নান, মুহূর্ত্তে সে কালিমা মিলায় !
চাহিনি যাহার পানে ভুলে' কভু, তারে আজ চিনি—
মূল্য তার ধরা প'ল হৃদয়ের নিকষ-শিলায়।

৩

আজ তব জন্ম-মাসে শরতের প্রসন্ন আকাশ
কি নির্ম্মল গাঢ় নীল, লঘু-শুভ্র মেঘ অন্তরালে !
ক্ষণ-বৃষ্টিপাতে হের জল ভরে তরু-আলবালে,
তবু রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—এ যে রাখী-পূর্ণিমার মাস !

ঘাসেও ফুটিছে ফুল—গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে কাশ,
স্বচ্ছ সরসীর তলে পঙ্ক হ'তে উঠিয়া মৃণালে
ফুটিছে পূজার পদ্ম !—তার মর্ম্ম তুমিই শিখালে,
দিকে দিকে হেরি আজ তোমার সে বাণীর বিকাশ !
বঙ্কিম—বসন্ত-বিধু, রবি—সে ত' সর্ব্বঋতুময়,
তুমি চন্দ্র শরতের, রশ্মি তব মর্ম্মান্ত-হরষ
এই পৃথ্বী-মৃত্তিকার !   তব করে লভিয়াছে জয়
তুচ্ছ তৃণ, অঙ্গে তার উজলিছে কাঞ্চন-পরশ !
চণ্ডালেরো গৃহে তব কিরণের পূর্ণ পরিচয়—
মানুষের সর্ব্বগ্লানি তব স্পর্শে শুচি ও সরস !

বঙ্গ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকাল বল্‌তে প্রকৃত পক্ষে সেই সময় বোঝায় যে সময়ে অধুনালুপ্ত মাসিকপত্রিকা "যমুনায়" তাঁর বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নারীর মূল্য, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এ হবে আনুমানিক বছর কুড়িক আগেকার, অর্থাৎ ১৩২০--১৩২১ সালের কথা। তার বহুপূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের দুটি রচনা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, 'মন্দির' এবং 'বড়দিদি'। মন্দিরে তাঁর নিজের নাম ছিল না; বড়দিদি ভারতী মাসিক পত্রিকায় তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম কিস্তিতে লেখকের নাম অপ্রকাশিত রাখা হয়েছিল, দ্বিতীয় কিস্তির কথা ঠিক মনে পড়ছে না, তৃতীয় কিস্তিতে লেখার শেষে শরৎচন্দ্রের নাম দেওয়া হয়েছিল।

বড়দিদির মধ্যে যে একজন বিশেষ শক্তিশালী লেখকের পরিচয় আছে তা তখনকার বিচক্ষণ সাহিত্যিকেরা বুঝতে পেরেছিলেন, যদিও পাঠক সাধারণের মধ্যে কিছু উপলব্ধি দেখা যায় নি।

এই 'বড়দিদি' সম্পর্কে একটি বেশ কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে। বড়দিদি যখন ভারতীতে প্রকাশিত হয় তখন নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন চলছিল এবং তার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীতে বড়দিদির প্রথম কিস্তি পাঠ ক'রে বঙ্গদর্শনের কার্য্যাধ্যক্ষ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হন এবং নিজের কাগজ

বঙ্গদর্শনের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে ভারতীতে লেখা দেওয়ার অপরাধে গুরুতরভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করেন। অপরাধ মোচনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তা হয়েছে, কখনো হয়ত ওরা কবিতা-টবিতা সংগ্রহ ক'রে রেখে থাকবে, প্রকাশ করেচে।" শৈলেশচন্দ্র চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললেন "কবিতা-টবিতা কি বলছেন মশায়? উপন্যাস!" কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ত' অবাক! বললেন, "উপন্যাস কি বলছ শৈলেশ? উপন্যাস লিখ্‌লামই বা কখন আর ভারতীতে তা প্রকাশিত হলই বা কেমন ক'রে? তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভুল করছ।" পকেটের মধ্যে প্রমাণ বর্ত্তমান তবু বলবেন ভুল করছ! বিরক্তি-গম্ভীর মুখে পকেট থেকে সদ্য-প্রকাশিত ভারতী বার ক'রে বড়দিদির পাতাটি খুলে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে স্থাপন ক'রে শৈলেশ বাবু বললেন, "নাম না দিলেই কি এ আপনি লুকিয়ে রাখ্‌তে পারেন? এখনো কি অস্বীকার করছেন?" শৈলেশচন্দ্রের অভিযোগের প্রাবল্যে ঔৎসুক্য বশতই হোক অথবা বড়দিদির প্রথম দু'চার লাইন প'ড়ে আকৃষ্ট হয়েই হোক রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সমস্ত লেখাটি আদ্যোপান্ত প'ড়ে শেষ করলেন, তারপর বল্‌লেন, "লেখাটি সত্যিই ভারি চমৎকার—কিন্তু তবুও আমার ব'লে স্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ লেখাটি সত্যই অন্য লোকের।" রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শৈলেশচন্দ্র ক্ষণকাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, "আপনার নয়?" এ অবশ্য প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের আকারে বিস্ময় প্রকাশ করা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই অনাবশ্যক প্রশ্নের মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন।

ভ্রমনিরসনের পর আর তথায় অপেক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচনা ক'রে শৈলেশচন্দ্র ভারতী কার্য্যালয়ের অভিমুখে রওনা হ'লেন। কিন্তু "বড়দিদির" লেখকের মধ্যে যে অদ্ভুত খেয়ালী মানুষটি বাস করে শৈলেশ বাবু যদি তাঁর পরিচয় জানতেন তা হ'লে ভারতী কার্য্যালয়ে না গিয়ে তিনি বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়েই ফিরে যেতেন। সন্ধান পেলেই এ লোকটিকে ধরা যায় না এবং ধরা দিলেই যে হঠাৎ সে একদিন বাঁধন কাটবে না তা'রও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ কথা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে।

বড়দিদি প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে একটি ডুব মারলেন। সে সুদীর্ঘ ডুব পাঁচ ছ মাসের মত নয়, পাঁচ ছ বছরের মত। শরৎচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথের গল্পটি তিনি আমাদের মুখে শুনেছিলেন,—কিন্তু তা শুনে তাঁর নূতন নূতন লেখা লেখবার অথবা প্রকাশ করবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় নি, যেমন প্রত্যেক সাধারণ সহজ লোকের হবার কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসোক্তি তখনকার দিনেও নূতন লেখকের পক্ষে বহুমূল্য সম্পদ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেবার কথা তাঁর মনে উদয় হয় নি। অথবা সম্পাদকদের আফিসে লেখা পাঠাবার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি। শৈলেশবাবুর গল্পটি শুনে তিনি অবশ্য পুলকিত হ'য়েছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই রকম পুলকিত হয়েছিলেন যেমন সাধারণ পাঁচজনের হবার কথা—অর্থাৎ কেবলমাত্র গল্পের কৌতুকের দিকটাই তাঁকে স্পর্শ করেছিল—অন্য কোনো দিকই নয়।

'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার পর যে নিষ্ফলা সুদীর্ঘ কালটি কেটে

গেল তার মধ্যে যে দুচার জন সাহিত্যিক বড়দিদির লেখকের জন্যে কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য বোধ করেছিলেন তাঁরাও ক্রমশঃ সে কথা বিস্মৃত হলেন। বাংলা দেশে অজ্ঞাত থাকল যে, তার ক্রোড়ে শরৎচন্দ্র নামে একজন অতি শক্তিমান লেখক বাস করছেন। তারপর অকস্মাৎ একদিন বাংলার সাহিত্য আকাশে আতসবাজির খেলা আরম্ভ হয়ে গেল! বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নারীর মূল্য, চন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন বিরাজবৌ—একের পর একটি, তারপর আর একটি—ভাবের এবং ভাষার সে অপরূপ লীলা দেখে বাংলার পাঠকমণ্ডলী চকিত বিমুগ্ধ হয়ে উঠল! মানুষের অন্তর এবং বাহিরের যত কিছু দুর্ভেদ্য রহস্য ছিল, এই প্রতিভাবান লেখকের লেখনীর ভিতর দিয়ে সেগুলি মূর্ত্তি লাভ করতে লাগ্‌ল। সমাজের মধ্যে যেখানে যা-কিছু দুঃখ দৈন্য লজ্জা গ্লানি ছিল, এই যাদুকর শিল্পীর সহানুভূতির অবলেপে ভাস্বর হয়ে উঠল। গতপ্রাণ পল্লীসমাজ সঞ্জীবিত হ'ল, সহরের মধ্যে নবতর চাঞ্চল্য দেখা দিল, গোঁড়ার দল শঙ্কিত হলেন, অগ্রবর্ত্তীর দল পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করল, অবজ্ঞাত ঘৃণিত-দল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাঙলার এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব চেতনায় স্পন্দিত হ'তে লাগ্‌ল। শরৎচন্দ্রের এই আকস্মিক এবং অপরূপ আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ঘটনাবলী বীজের মত ক্রিয়ার দ্বারা সেই আবির্ভাবটিকে ঘটিয়েছিল তার ইতিবৃত্তটুকু কম কৌতুকপ্রদ নয়। শরৎচন্দ্র ভিন্ন সে ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রধানতঃ দুটি ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট —যমুনা সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল এবং বর্ত্তমান লেখক! এখানে সে ঘটনাবলী প্রকাশ করলে প্রাসঙ্গিক হোত, কিন্তু সে

বিষয়ে দুটি আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, শরৎ-বন্দনা পুস্তকের সম্পাদক জানিয়েছেন যে, সময়ের একান্ত অভাব। এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই ঘটনাগুলি অবলম্বন ক'রে একটি প্রবন্ধ লিখে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির কল্পিত পুস্তকে দেবার জন্যে প্রতিশ্রুতি আছে। সে পুস্তকটি প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা যদি এখনো থাকে তা হ'লে সেখানেই লেখাটি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধ থেকে পরিত্রাণ পাবার আশা রাখি।

শরৎচন্দ্র আমার আত্মীয়। বয়সে তিনি আমার চেয়ে কিছু বড় হলেও আত্মীয়তার সোপানে আমি তাঁর উপরে। সুতরাং তাঁর এই শুভ সপ্ত-পঞ্চাশত্তম জন্মদিবস-উৎসব উপলক্ষে আমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করি, হে শরৎচন্দ্র, তুমি তোমার যশোভাতির দ্বারা, শুধু বাঙলা সাহিত্যকেই নয়, আমাদের বংশকেও উজ্জ্বল করেছ। তুমি দীর্ঘায়ু হও।

শরৎ-প্রতিভা

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

কথা যে মানুষের প্রাণের জিনিস—গল্প যে মানবের চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে, ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত সত্য। সভ্য মানব ত দূরের কথা—অসভ্য মানবজাতির মধ্যেও এই গল্পানুরাগ সমধিক প্রবল।

দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বিশিষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের প্রিয় হইলেও বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক ও অনবদ্য কথা-সাহিত্যের রসলোকে উঁকি মারিয়া ক্ষণকালের জন্যও আপনাকে উন্নীত করিবার প্রবল আকর্ষণকে দমন করিতে পারেন না। মানবমন স্বভাবতই গল্প শুনিতে ভালবাসে। ইহার প্রভাব ও শক্তি অমোঘ, অসামান্য। সুরচিত, সুচিন্তিত কথা-সাহিত্য শুধু মানবকে আনন্দদান করে না, ইহা মনুষ্যচরিত্রের উৎকর্ষ বিধান করে, সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানবচিত্তকে চিরসুন্দরের অম্লান সৌন্দর্য্যরসে অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাকে।

কথা-সাহিত্য-রচয়িতা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিক চিত্রকরের ন্যায় তাঁহার শক্তিশালী লেখনীরূপ তুলিকার সাহায্যে দৃষ্ট বিষয় ও ঘটনাকে রঙীন করিয়া তুলেন।

আর এক শ্রেণীর কথা-শিল্পী আছেন, যাঁহারা জীবনযাত্রার পর্য্যায়ে

যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহার কারণ পরম্পরা উদ্ভাবন করিয়া অন্তর্গূঢ় তত্ত্বটিকে মহিম জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর কথা-সহিত্যিকদিগকে শুধু দ্রষ্টা বলা চলে। অপর শ্রেণীর কথা-শিল্পী স্রষ্টা। দ্রষ্টা ও স্রষ্টার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাহা শক্তি ও সাধনার তারতম্য অনুসারেই ঘটিয়া থাকে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অসামান্য শক্তিশালী শরৎচন্দ্র একনিষ্ঠ সাধনার বলে স্রষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অভিনব অমৃত রস পরিবেষণ করিতে পারিয়াছেন। মানবমনের জটিলতম রহস্য সমূহ তাঁহার ধ্যান স্তিমিত দৃষ্টির সম্মুখে বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অপরাজেয় লেখনীর ইন্দ্রজাল সাহায্যে বিচিত্র ভাব ও রসে সেই তত্ত্ব সমূহকে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

তাঁহার সুসংযত ভাষা ও নিপুণ বিন্যাস পদ্ধতির চমৎকারিত্ব তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহকে সাহিত্যে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে", "পণ্ডিত মশাই" "দত্তা" "চন্দ্রনাথ" "পল্লী সমাজ" প্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে নানা বিচিত্র ভাবধারায় পাঠকের মন অপূর্ব্ব রসাশ্রিত কল্পলোকে উপনীত হয়। রসের সমুদ্রে অবগাহন করিয়া রসস্রষ্টাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাহাদের চিত্ত অধীর হইয়া উঠে।

শরৎচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যে কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অত্যুজ্জ্বল রত্নসমূহ দান করিয়াছেন, তাহার দীপ্তি বঙ্গ-সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিয়া

তুলিয়াছে। ইন্দ্রনাথ, অভয়া, দেবদাস প্রভৃতি চরিত্রগুলি এক একটা বিশিষ্ট সৃষ্টি-গৌরবে বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে নিপীড়িত জনের প্রতি দরদ অকৃত্রিম-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার পল্লী-সমাজের নিগৃহীত নরনারী যাহারা, তাহাদিগের প্রতি সমবেদনা শরৎচন্দ্র-রচিত সাহিত্যের একটা বিশিষ্টতা। নারী-হৃদয়ের ব্যথা ও বেদনা, অভাব ও অভিযোগ তাঁহার চিত্তে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তিনি উপেক্ষা করেন নাই। দরদীর মন লইয়া নিপুণ তুলিকায় তিনি সে দরদকে সমগ্র অন্তর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই।

শরৎচন্দ্র

শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালা-সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন। মানুষের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচয় ঘটিয়েছেন। বইয়ের পাতায় নায়ক নায়িকারা আগে ছিলেন বইয়েরই জগতের লোক, বইয়ের দেশে ছিল তাঁদের বাড়ী অবাস্তব মেঘরাজ্যে তাঁরা ছিলেন স্বপ্নবিহারী। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল আরও ঘনিষ্ঠ আরও অন্তরঙ্গ ভাবে, তাদের পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা এমন কি দৈনন্দিন আহার বিহারের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটল। বইয়ের দেশে বিচরণকারী অলৌকিক প্রাণী থেকে তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন পৃথিবীর মাটির রক্তমাংসের জীব, আমাদের বুকের স্পন্দনের সঙ্গে তাঁদের বুকের স্পন্দনের যোগসূত্র স্থাপিত হল, তাঁদের আমরা চিনি জানি। দুঃখ-দৈন্য নিপীড়িত জীবনের পথে পথে এঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সত্য ও নিত্য। তাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারী আমাদের সুপরিচিতও বটে, অতি প্রিয়ও বটে; তাই তাদের সুখ-দুঃখ আমাদের বুকের রক্ত দোলা দেয়, কেননা তারা আমাদেরই আপনার জন। সাহিত্যে এই নব-নীতির প্রবর্ত্তন করলেন শরৎচন্দ্র কথা সাহিত্যে নব-পদ্ধতির জনক তিনি।

মানুষের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল তিনি যেমন বাড়িয়ে তুলেছেন সে কৌতূহল তেমনিই তৃপ্তও করেছেন। অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লী নরনারীর মর্ম্মকথা এর আগে এমন করে কেউ শোনায়নি। শরৎচন্দ্রের বইয়ের পাতা উল্টে যাবার মধ্যে নতুন আবিষ্কারের একটা

আনন্দ আছে, নিত্য নব পরিচয়ের কৌতূহল আছে। সকল প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এখানে। তারা আমাদের কাছে এত জীবন্ত যে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নব নব ঘটনা দ্বন্দ্বের মধ্যে তারা কি ভাবে কাজ করবে কি ভাবে চলবে তাও যেন আমরা জানি, কিন্তু জানি কি ঠিক? তারা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও সুপরিচিত হয়েও এত সুদূর ও এত রহস্যময় যে তাদের সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণীতেই মন সায় দেয় না। তাদের অন্তর্লোকের নিগূঢ় ও ঘনীভূত রহস্য আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে। এই যে অন্তর্দৃষ্টি, এই যে লিপিকৌশল নিম্নশ্রেণীর কোন artistএর পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব হত। শরৎচন্দ্র দ্রষ্টা বলেই জেনেছেন যে মানুষের মন কত বড় রহস্যময় অনাবিষ্কৃত মহাদেশ-তার কোন পরিমাপও নেই, সীমাও নেই। কোন খাতে সে কখন চলবে আগে থেকে সে সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা চলে না, তার সৌন্দর্য্য সম্ভবতা যেমনই বিরাট তেমনই অনির্দ্দেশ্য।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর অদ্বিতীয় সংযম। এ সম্বন্ধে যোগ্যতর ব্যক্তিরা যথেষ্ট আলোচেনা করেচেন আমার যা মনে হয়েচে, সামান্য একটু বলি। হাতের কাছে "মেজদিদি" বইখানা রয়েছে, যদৃচ্ছাক্রমে খুলে শেষের তিন পাতা পড়লুম-কোথাও লিপি বাহুল্য নেই, একটী বাড়তি কথা নেই অথচ রস যেমন ঘন সন্নিবিশিষ্ট তেমনি সুপ্রচুর। ছ'খানা সাদা কাগজের মধ্যে কালি ও কলমের সাহায্যে যে এতখানি রস ফুটিয়ে তুলতে পারে, স্নেহপ্রবণ নারীর হৃদয়ের গোপন অন্ধি-সন্ধির ভিতর যে এতটা আলোক সম্পাত করতে পারে, সে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বাংলার ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শরৎ-বন্দনা-উৎসবে প্রথমেই যে কথা মনে করে গভীর আনন্দ লাভ করি, তা হচ্ছে এই যে, শরৎচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী। বাংলার হাট মাঠ, বাংলার সুখ দুঃখ, বাংলার ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়, দোষগুণ তাঁর বাঙালী হৃদয়ে স্থান পেয়েছে, সাহিত্যে সে ভাবের পরম প্রকাশ দেখেছি।

যে নির্ভীক সত্যনিষ্ঠার দ্বারা তাঁর রচনা অনুরঞ্জিত হ'য়েছে সেই সত্যনিষ্ঠার কষ্টিপাথরের সাহায্যে তিনি বাংলার প্রকৃত রূপটিকে প্রকাশ করেছেন,—শরৎ-সাহিত্যে আমরা সত্যকার বাংলাকে দেখলাম। এ সত্য বাইরের সুস্পষ্ট খোলসমাত্র নয় আমাদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যে সত্য ফল্গুনদীর মত দেশের অন্তরে বিরাজ করে, শরৎচন্দ্র সেই সত্যকে তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে সঞ্জীবিত করেছেন। বাংলাকে এত গভীরভাবে ভালো না বাস্‌লে শরৎচন্দ্রের মত অত বড় প্রতিভাবানের পক্ষেও এটা সম্ভব হ'ত না। কারণ এ শুধু প্রতিভার কাজ নয়। বাংলার দোষ ত্রুটি দেখিয়ে তীব্র তিরস্কার করার অধিকার তিনি পেয়েছেন, সেই তিরস্কারের বহিরাবণের অন্তরালে এক করুণাকোমল অশ্রুসজল অন্তঃকরণ আছে বলে। যখন তিনি আঘাত করেন, তখন তিনি নিজে দুঃখ পান, তাঁর মাতৃভূমিকে তিনি ভালবেসেছেন, সেইজন্যেই তার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়ে তিরস্কার করবার তিনি শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

সাহিত্যিকে যে কতটা Seriously নেওয়া দরকার সেকথা আমরা শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি। সাহিত্য যে বাস্তবিকই কত সাধনার বস্তু, কি সুদীর্ঘ তপস্যার ফলে-কত দুঃখক্লেশের দহনের মধ্য দিয়ে যে বীণাপাণির কমলবনে স্থান লাভ করা যায়, শরৎচন্দ্র তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বঙ্গসাহিত্যগগনের এই একমাত্র চন্দ্রস্বরূপ জ্যোতিষ্কটিকে শ্রদ্ধার সহিত বারংবার নমস্কার করি।

শরৎ-বন্দনা

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় জয় শরৎচন্দ্র, মোহিয়াছ বাঙ্গালীর প্রাণ,
পিয়াসীর রসনায় ক'রেছ অনেক সুধা দান।
যে-বন্দন-বরমাল্য তোমার শ্রীকণ্ঠে আজি দোলে,
গাঁথা তাহা বাঙ্গালীর পরম শ্রদ্ধার শতদলে।

জীবনের বিষামৃত, মানব-মনের ইতিহাস
লিখেছ সোনার জলে, রসের কি চিন্ময় প্রকাশ!
কল্যাণ-বিদ্রোহ-মূর্ত্তি, জাগায়েছ তরুণ স্পন্দন,
তারি পূর্ণ প্রতিধ্বনি বাণীরূপ এ-অভিনন্দন।

কত নরনারী-কণ্ঠ, কি উৎসব রূঢ়-সুমধুর!
সুখের দুখের দিনে কত ঘাত-প্রতিঘাত সুর!
কত 'পুরলক্ষ্মী'-'বিভা,' 'বিশ্বেশ্বরী' অর্দ্ধ-অবিস্মৃতা,
'শৈলজা,' 'সুনন্দা' আসে, 'ভবানী' সে পুনঃ-পরিচিতা।

চিত্র-দীপ-শিখা তব জ্বালায়েছে গোপন অনল,
কলাবতী কিশোরীর নর্ম্মলীলা-কটাক্ষ উজ্জ্বল,
অন্তর-আকুতি-রেখা ফুটিয়াছে আঁখির তারায়,
ঝুরিছে আলোর ফোঁটা অন্তর্গূঢ় ভাব-ব্যঞ্জনায়।

মর্ত্ত্য নহে নিষ্কলঙ্ক, কহিয়াছ সত্য সুভাষিত,
দেবাসুর-দ্বন্দ্ব-মাঝে নারীত্বের বিচিত্র চরিত,—
অমঙ্গল-অন্তর্ধানে মঙ্গলের অস্তিত্ব না রয়,
কামনার আবেষ্টনে চিরঞ্জীব প্রেমের উদয়।

'মহেশ' অমর-পশু তোমার মহদ্-অনুভবে,
মৃত্যুরে ক'রেছে মৃত স্মৃতি তার ব্যথার গৌরবে।
বাজিছে তোমার শঙ্খে সাহিত্যের সমুদ্র-স্তনিত,
নব প্রজাগর-পর্ব্বে নব দুর্গ নিত্য-অধিকৃত।

থামে নাই শেষ যুদ্ধ, সমস্যার নাহি সমাধান,
চিত্তের শোধন কোথা? কে দেখায় পথের সন্ধান?
নৈরাশ্য-বিজয়ী বীর, বন্দি তোমা বাণী পুত্রবর,
সংস্কার-নির্মুক্ত তীর্থে অগ্রগামী নব তীর্থঙ্কর।

শরৎ-প্রসঙ্গ

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

বাণীর মন্দির-পথে চলিবার বাসনা জাগিয়া ছিল বারো বছর বয়স হইতে। কবিতার খাতা হাতে এ পথে প্রথম আসি। বন্ধু উপেন্দ্রনাথ ও শ্যামরতন এ পথে আমার প্রথম সহচর। গল্প লিখিবার জন্য আগ্রহের অন্ত ছিল না—কিন্তু দু'লাইন গদ্য লিখিতে গেলে পাঁচটা ইংরাজি কথা আসিয়া সে প্রয়াস ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিত!

তারপর ইংরাজী ১৯০০ সালের কথা। শীতকাল। ভাগলপুরে এফ-এ পড়ি—বিভূতি ভট্ট সতীর্থ, বন্ধু—তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ি, পড়িয়া মুগ্ধ আবেগে কত কি কথা চলে!

কি একটা কারণে সেদিন কলেজের ছুটী ছিল—বিভূতির গৃহে হাজির হইলাম - বেলা প্রায় বারোটা। তারা একটি দল জড়ো করিয়াছে—আদমপুরের ক্লাব-গ্রাউণ্ডে ক্রিকেট খেলিতে চলিয়াছেন। আমার শরীর ভালো ছিল না। আমি কহিলাম,—আমি খেলিব না—একখানি বই দাও, মাঠে বসিয়া পড়িব।

হাতে লেখা একখানি গল্পের খাতা বিভূতি আমায় দিলেন। গল্পগুলি শরৎচন্দ্রের লেখা। বেশ মনে আছে, মোটা বাঁধানো খাতা—ঝরঝরে পরিষ্কার ছোট অক্ষরগুলি তার মত সাজানো—খাতায় গল্প ছিল। 'বোঝা', কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম' প্রভৃতি।

মাঠে বসিয়া গল্পগুলি পড়িলাম। রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্পের পর এমন গল্প পড়ি নাই! অথচ এ সব গল্প ছাপা হয় না। ফিরিবার সময় সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় বিভূতির সঙ্গে গল্পগুলির আলোচনা চলিল।

অবাধে নানা মন্তব্য করিতেছিলাম। তার ক'দিন পরে বিভূতির গৃহে একটী ছুটীর দিনে নিমন্ত্রণ ছিল ; গেলাম। বিভূতির ঘরে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া এক শীর্ণ ভদ্রলোক—মাথায় দীর্ঘ কেশ, মুখে দাড়িগোঁফ," অবিন্যস্ত—কি যেন ভাবিতেছেন !

বিভূতি ডাকিল—শরৎদা—

ভদ্রলোক মুখ তুলিলেন। বিভূতি কহিল,—এই আমার সেই বন্ধু সৌরীন,—দারুণ রৈবিক (রবিভক্তদের আমরা নাম দিয়াছিলাম রৈবিক) তোমার গল্পের সমালোচনা করেছিল—কবিতা লেখে।

শরৎচন্দ্র মুখ তুলিয়া আমার পানে চাহিলেন—প্রতিভাদীপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—সে দৃষ্টি মর্ম্ম বিদ্ধ করে !

শরৎচন্দ্র কহিলেন—তুমি গল্প লেখো ?

অত্যন্ত কুণ্ঠিতস্বরে আমি কহিলাম,—না।

শরৎচন্দ্র ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন—দৃষ্টি আমার মুখে। পরে কহিলেন,—কেন লেখোনা ?

আমি কহিলাম—গল্প লিখতে গেলে এত ইংরাজী কথা কলমের মুখে আসিয়া পড়ে ! বাঙলা প্রতিশব্দ বহু প্রয়াসে খুঁজিয়া পাই না।

শরৎচন্দ্র হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—লেখো গল্প। আমার গল্প সম্বন্ধে তুমি যে মতামত দিয়েছো তার মধ্যে বস্তু আছে। ছোট গল্পে বৈশিষ্ট্য কি, তার idea তোমার আছে। এ কথা তীরের মত মর্ম্ম বিঁধিল। গল্প লেখার সাধনায় মাতিয়া উঠিলাম। কবিতা লেখা বন্ধ হইল।

১৯০১ সালে ভবানীপুরে ফিরিয়া কয় বন্ধুতে মিলিয়া ছাত্র সমিতি গড়িয়া তুলিলাম। হাতে-লেখা মাসিকপত্র "তরণী" বাহির করিতে

লাগিলাম। আমি সম্পাদক ও প্রকাশক—আমার প্রধান সহযোগী উপেন্দ্রনাথ (বিচিত্রা-সম্পাদক)। প্রবন্ধ কবিতা সকলে লেখে—গল্প নাই। কে লিখিবে? প্রথমে আমার পালা পড়িল—গল্প লিখিলাম—তারপর উপেন্দ্রনাথ গল্প লিখিলেন। শরৎচন্দ্রপ্রমুখ বিভূতি, গিরীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথও ওদিকে ভাগলপুর হইতে হাতে-লেখা মাসিক বাহির করিলেন—ছায়া। দু'দলে পত্রিকা বিনিময় হইত এবং পরস্পরের লেখা আক্রমণ করিয়া বিদ্রূপ বাণে পরস্পরকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবার দিকে বিরাট সমারোহ চলিল। ঠিক সেই আহির গ্রাম আর জাহির গ্রামের ভঙ্গীতে।

১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্র ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন উপেন্দ্রনাথের গৃহে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের কিশোর-সভা সাহিত্যালোচনায় মস্ত সুযোগ লাভ করিল। তাঁর কথায় গল্প লিখিলাম, 'বৌদির কাণ্ড'। গল্পটি লিখিয়া কুন্তলীন পুরস্কারে প্রতিযোগিতায় পাঠাইলাম। অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র 'মন্দির' গল্প লিখিয়া সুরেন্দ্রনাথের বেনামীতে নিঃশব্দে কুন্তলীন-গল্প প্রতিযোগিতায় দিয়া আসিলেন। প্রথম পুরস্কার তিনিই পান্—অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের বেনামীতে। একথা শুধু আমরা জানিতাম। সাধারণে নয়। তারপর তিনি ব্রহ্মদেশে গেলেন—অজ্ঞাতবাসে।

বাংলা ১৩১৪ সালে ভারতীর আসরে আমি আসিয়া জুটিলাম। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী থাকেন লাহোরে, ভারতীর সম্পাদন-ভার পড়িল আমার হাতে। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শান্তে শরৎচন্দ্রের লেখা 'বড়দিদি' গল্প তাঁহার বিনানুমতিতে বৈশাখ সংখ্যার ভারতীতে ছাপিয়া বাহির হয়। ব্রহ্মযাত্রাকালে শরৎচন্দ্র তাঁর রচনাগুলি সুরেন্দ্রনাথের

হেফাজতে রাখিয়া যান। 'বড়দিদি' ছাপা হইলে সাহিত্য-জগতে একটা sensation পড়িয়া গেল—কে এই শক্তিমান শরৎচন্দ্র? কোথায় থাকেন? অনেকে সে লেখা রবীন্দ্রনাথের বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এজন্ত তাঁহাকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন,—উপন্যাস লিখিবেন না বলিয়াছেন—এই তো আবার ছদ্মনামে লিখিয়াছেন। এ কথা শৈলেশচন্দ্র নিজে আমায় বলিয়াছিলেন; পরে রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনিয়াছিলাম।

সাহিত্য-সম্পাদক-সুরেশ সমাজপতি মহাশয় এবং আরো নানা পত্র পত্রিকার সম্পাদক আমায় ধরিলেন—শরৎবাবুর লেখা আনাইয়া দাও। আমি কহিলাম—অসম্ভব।

তারপর ১৩১৯ সাল—পূজার সময় হঠাৎ শরৎচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। আমায় বলিলেন—বড়দিদি গল্পটা আমায় পড়িতে দাও—

বেশ মনে আছে সেদিন কালীপূজা। বেলা প্রায় দুটার সময় আমার গৃহে বাহিরের ঘরে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও আমি—বাঁধানো ভারতী খুলিয়া আমি 'বড়দিদি' পড়িতে লাগিলাম। শরৎচন্দ্র শুইয়া সে গল্প শুনিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে উঠিয়া বসেন। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন—চুপ। তাঁর চোখ অশ্রু-সজল, স্বর-বাষ্পার্দ্র। শরৎচন্দ্র মুগ্ধ বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে বলিলেন—এ আমার লেখা! এ গল্প আমি লিখিয়াছি!

তাঁর যেন বিশ্বাস হয় না! আমরা তাঁকে তিরস্কার করিলাম—লেখা ছাড়িয়া কি অপরাধ করিতেছ, বলো তো! শরৎচন্দ্র উদাস মনে বসিয়া রহিলেন—বহুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—লিখবো। লেখা ছাড়া উচিত হয় নাই। লেখা ভালো—আমার নিজের বুকই কাঁপিয়া

উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন,—চাকরিতে একশো টাকা মাহিনা পাই। অনেককে খরচ দিতে হয়। শরীর অসুস্থ—সেদেশে আর কিছুদিন থাকিলে যক্ষ্মারোগে পড়িবেন—এমন আশঙ্কাও জানাইলেন।

আমি বলিলাম—তিন মাসের ছুটী লইয়া আপাততঃ কলিকাতায় চলিয়া এসো। মাসে একশো টাকা উপার্জ্জন হয়—সে ব্যবস্থা আমরা করিয়া দিব।

শরৎচন্দ্র কহিলেন—দেখি।

তার প্রায় তিনমাস পরে। শরৎচন্দ্র আবার কলিকাতায় আসিলেন। 'যমুনা'-সম্পাদক ফনীন্দ্র পাল আমায় ধরিয়াছেন—ঐ 'যমুনা'কে তিনি জীবন-সর্ব্বস্ব করিতে চান, আমার সহযোগিতা চাহেন।

শরৎচন্দ্র আসিলে তাঁকে ধরিলাম—এই যমুনার জন্য লিখিতে হইবে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—একখানা উপন্যাস চরিত্রহীন লিখিতেছি। পড়িয়া ছাখো চলে কি না।

প্রায় পাঁচ আনা অংশ লেখা 'চরিত্রহীনের' কাপি তিনি আমার হাতে দিলেন। পড়িলাম। শরৎচন্দ্র কহিলেন—নায়িকা কিরণময়ী। তার এখনো দেখা পাও নাই। খুব বড় বই হইবে।

'চরিত্রহীন' যমুনায় ছাপা হইবে স্থির হইয়া গেল।—তিনি অনিলা দেবী ছদ্ম-নামে 'নারীর মূল্য' আমায় দিয়া বলিলেন—আমার নাম প্রকাশ করিয়ো না। আপাতত। যমুনায় ছাপাও।

তাই ছাপানো হইল। তারপর দিলেন গল্প—"রামের সুমতি।" যমুনায় ছাপা হইল। বৈশাখের যমুনার জন্য আবার গল্প দিলেন—পথনির্দ্দেশ।

এমনি করিয়া শরৎচন্দ্র আবার অবহেলার প্রায়শ্চিত্তান্তে সাহিত্য-সেবায় নামিলেন। আমাদের ছোট্ট গণ্ডী ছাড়িয়া ক্রমে তিনি সকলের মাঝে আপনাকে কি ভাবে প্রসারিত করিয়া দিলেন, সে কথা কাহারো অবিদিত নাই।

তবে সাধারণে আজ তাঁকে পূর্ণরূপে এই যে পাইয়াছে, ইহার মূলে আমাদের ছোট-খাট যেটুকু চেষ্টা ছিল, আজ এই শুভক্ষণে সে কাহিনী সংক্ষেপে বলিয়া সত্যই গর্ব্ব বোধ করিতেছি।

ছোট গল্প ছাড়িয়া আমায় তিনিই উপন্যাস লিখিতে বলেন—তাঁহার কথা মানিয়া আমি ছোট গল্পে ও উপন্যাসে আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিতেছি। এদিনে গৌরব-গর্ব্বে সে কথা যদি উপসংহারে বলি, বলিয়া শ্লাঘা বোধ করি, তাহা হইলে বোধ হয় সে খুব বেশী অপরাধ হইবে না।

শরৎ বন্দনা

গান

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

শরৎ আলো,
প্রাণের আলো
এলো এলো এলোরে !
পরাও ভালে,
তিলক-লিখা
বিজয়-বিষাণ তোলরে !!
বাংলা মায়ের সোণার ছেলে,
বাণীর বরের পরশ পেলে,
বরণ করে,
তোলো ঘরে,
জয়ের প্রদীপ জ্বালো রে !!
বিশ্ব-গুণীর সভাতলে
জ্ঞানের আসন পাত্‌লো যে
রত্নাকরের আগার খুলি,
রত্নমালা আন্‌লো সে—
সেই সে গুণী রূপগুণাকর
আজ্‌কে এলো সবার ভিতর,
বন্দনা গান
ছন্দ সুতান
কণ্ঠ-সুধায় ঢালোরে !!

শরৎ-বন্দনা

বাংলার বরণ্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

করকমলে—

বাংলার সাহিত্যাকাশ যে দিন ধরণীর সর্ব্বোজ্জল রবিকরে সুপ্রদীপ্ত সেই অদ্বিতীয় আদিত্যের অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটায় সকল গ্রহনক্ষত্রের আলোকরেখা যে দিন পরিম্লান,—সেদিনের সেই রবিকরোদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময় যুগে বঙ্গবাণীর দিকচক্রবালে যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার অপরাজেয় দীপ্তি আপনার দিব্য মহিমায় সকলজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, হে শুভ্রসুন্দর শরৎচন্দ্র। তুমিই সেই জ্যোতিষ্মান্, আমরা তোমার বন্দনা করি॥

শরতের পূর্ণচন্দ্রের অফুরন্ত জ্যোৎস্নাপ্লাবনেরই মত তোমার কথা সাহিত্যের কণক কৌমুদী এদেশের নবনারীর মর্ম্মে সুগভীর আনন্দ-বেদনার বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়াছে. তোমার প্রাণবন্ত সৃষ্টি তাহাদের দীর্ঘ তন্দ্রাহত অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, স্পন্দিত করিয়াছে, সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে বাংলার কথা সাহিত্যের অসামান্য শিল্পি! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

পরাধীন বাংলার অধঃপতিত সমাজের অসহায়া অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দবেদনাকে তুমি ভাষায় মূর্ত্ত করিয়া ধরিয়াছ। তাহাদের দুর্গত জীবনের সকল দুঃখসুখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছ। তোমার অনাবিষ্ট দৃষ্টি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা সুগভীর উপলব্ধি শক্তি, বিচিত্র মানব-চরিত্রের অতুল অভিজ্ঞতা—নিখিল নারীচিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করিয়াছে। হে নারীচরিত্রের নিবিড়-রহস্য জ্ঞাতা! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

সর্ব্ববিধ আত্মাবমাননা সর্ব্ববিধ হীনতার অবস্থার মধ্যেও নারীর সহজ প্রকৃতি-জাত যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকল দেশের সকল কালের সকল সমাজে বর্ত্তমান, তুমি তাহার অকৃত্রিম রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহার সত্যপ্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মৌনভাষা বুঝিতে পারিয়াছ। হে সকল নারীর অন্তর্য্যামি! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

আজ তোমায় এই সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের অভিনন্দন বাসরে আমরা আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমাদের মনের ভাব সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখি নাই; তবুও আজিকার এই বিশেষদিনে তোমাকে আমরা কেবল এই কথাই জানাইতে আসিয়াছি তোমারে প্রতিভাকে আমরা বরণ করি। তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তোমাকে আমরা ভালবাসি। তোমাকে আমরা আমাদের একান্ত আপনজন বলিয়াই জানি। হে নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

তুমি আমাদের সকৃতজ্ঞ প্রণিপাত গ্রহণ কর। তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমাদের পরম প্রিয় তুমি, পরম আত্মীয় তুমি। তোমার এই শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান বাংলার গৃহে গৃহে বর্ষে বর্ষে যোগ্য সমারোহে প্রতিপালিত হউক।

তোমার যশঃ ও আয়ু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। তোমার সুখ ও স্বাস্থ্য চির অব্যাহত থাকুক। তোমার জীবন আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে হেমবিমণ্ডিত হউক—অন্তরের এই ঐকান্তিক কামনা লইয়া হে নারী-হৃদয়ের মরমী ঋষি! আমরা তোমার বন্দনা করি।

তোমার

স্বদেশবাসিনিগণ

শরৎ-বন্দনা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে

হে বঙ্গবাণীর বরপুত্র!

তোমার সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিবসে সমবেত স্বদেশবাসীর বন্দনা গ্রহণ কর। আমরা আজ আমাদের হৃদয়ের পাত্রে যে প্রগাঢ় প্রীতির অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছি, তোমার নিরভিমান স্নেহসিঞ্চিত প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তাহা সার্থক কর।

বঙ্গসাহিত্যে তোমার আবির্ভাব শরতের পূর্ণচন্দ্রের মতই পরিপূর্ণ ও প্রভা-সুদীপ্ত। তোমার প্রথম উদয়-ক্ষণে বাঙ্গালী-হৃদয় চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের মতই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে আমরা সেদিন দেখিয়াছিলাম তুমি তোমার জ্যোতির্ময় প্রতিভার দ্যুতিতে অন্তরের সুনিবিড় অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দুঃখের মলিন মূর্ত্তিকে ভাস্বর করিয়া তুলিলে। ইহা তোমারই পক্ষে সম্ভব, যেহেতু তুমি সত্যের সাধনায় বহু অন্ধকার রাত্রি অতন্দ্র থাকিয়া দুঃখের সমগ্র রূপকে ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

হে দুঃখ বেদনার রহস্যবিৎ। বঞ্চিত-স্নেহ এবং উপেক্ষিত-প্রেমের নির্দ্দয় আঘাতে বিপর্য্যস্তা বঙ্গনারীর সংযত ধৈর্য্যের মহিমাকে তুমি বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে বসাইয়া মহীয়সী করিয়াছ। পৌরুষহীন সমাজের অচেতন মনকে তুমি তার বিগত গৌরবের মূঢ় মোহ হইতে জাগ্রত করিয়াছ। আমাদের জীবনের যত কিছু সঞ্চিত লজ্জা, অপমান